Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিন্দুইজম এবং ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সোনিয়া আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১১১৯

৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিন্দুইজম এবং ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সোনিয়া আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১১১৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "হিন্দুইজম এবং ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সোনিয়া আক্তার, আইডিঃ ২১৫০০১১১৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "হিন্দুইজম এবং ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sonia

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সোনিয়া আক্তার

আইডিঃ ২১৫০০১১১৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১. ভূমিকা	৭
২. যেকোনো ধর্মকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য করনীয়	৮
৩. ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের মূল উৎস	৮
৪. ইসলামের পরিচিতি	৯
৫. ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা	৯
৬. হিন্দু ধর্মের পরিচিতি	১০
৭. ইসলামে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা	১১
৮. হিন্দু ধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা	১৩
৯. হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ্ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে	১৭
১০. হিন্দুধর্ম ও ইসলামে আল্লাহর বাণী বা ঐশ্বরিক বাণী (ওহি) সম্পর্কে ধারণা	১৮
১১. ইসলামে আল্লাহর বাণী (ওহি) সম্পর্কে ধারণা	১৮
১২. হিন্দুধর্ম গ্রন্থ	২০
১৩. হিন্দুধর্ম ও ইসলামে নবুওয়তের ধারণা	২৪
১৪. মহানবী মুহাম্মদ (সা:) সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসূল	২৬
১৫. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে	২৬
১৬. হিন্দুধর্মে অবতার ও দূত	২৬
১৭. স্রষ্টার গুণাবলি	২৮
১৮. সৃষ্টিকর্তা মানুষের রূপ ধারণ করেন না এবং করবেনও না	২৯
১৯. হিন্দুধর্ম গ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী	৩৪
২০. হিন্দুধর্ম ও ইসলামে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ধারণা	৩৬
২০.১ হিন্দুধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন	৩৬
২০.২ ইসলামে মৃত্যুর পরের জীবন	৪১
২১. হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের শিক্ষার মধ্যে সাদৃশ্য	৪৪

বিষয়বস্তু	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**
২২. হিন্দুধর্ম ও ইসলামে ভাগ্য (তাকদীর) ও কদর সম্পর্কে ধারণা	৪৬
২৩. হিন্দুত্ববাদ নিয়ে সাধারণ প্রশ্ন-উত্তর	৪৯
২৪. দাওয়াহ দেওয়ার পদ্ধতি (কথোপকথন)	৫৮

লেখকের কলম

আলহামদুল্লিাহ্ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি এত বড় একটি কাজ আঞ্জাম করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অসংখ্য-অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি সেই মহামহিম রব্বে কারীমের, যিনি "হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য" এসাইনমেন্ট এর কাজ সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। দোয়া করবেন আল্লাহ তা'আলা যেন এসাইনমেন্টটিকে কবুল করে নেন; সাথে সাথে আমি অধমকেও। এছাড়া, এসাইনমেন্টটি যেন আমার নাজাতের উছিলা হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাকি কাজগুলো করতে পারি সেজন্যও দোয়া করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই, কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। এর মধ্যে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এই এসাইনমেন্টটির বেশির ভাগ তথ্য ডা. জাকির নায়েকের লেকচার এবং তার লেখা "Similarities Between Hinduism and Islam" বই থেকে নেওয়া।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলা-মিনের এবং দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ মুসলিম তারপর হিন্দু ধর্মের মানুষ এভাবে আরো বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষ বসবাস করে। আমরা জানি প্রতিটি অমুসলিম মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জাহান্নামী। এজন্য সকল মুসলিমের জিম্মাদার হলো অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া। সেই চিন্তা থেকে হিন্দু ধর্মের বিষয়ে জানার ইচ্ছা হলো। সেটা থেকেই হিন্দু এবং ইসলামের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য খুজে পেলাম। আর আল্লাহ তায়ালা ৩নং সূরা আলে ইমরান ৬৪ আয়াতে বলেছেন-

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

বল, ‘হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, ‘তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

কোনো ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে সে বিষয়ে কিভাবে আমরা জানবো এবং ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে কোথায় কোথায় মিল আছে সেটা জানতেও এই লেখাটা সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ। এই লিখাটা লিখতে আমাকে ডা.জাকির নায়েকের লেকচার, তার বই এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় মুফতি জুবায়ের আহমদ ওস্তাদের বই এবং বিভিন্ন বক্তব্য অনেক সাহায্য করেছে আলহামদুলিল্লাহ। আর সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছু সম্ভব না।

যেকোনো ধর্মকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য করনীয়

সবার আগে কোনো ধর্মকে জানার জন্য সেই ধর্মের উৎস অর্থাৎ আসমানী বা পবিত্র গ্রন্থমালা সম্পর্কে জানা ও বোঝা দরকার। যারা ধর্ম অনুসরণ করে তাদের দেখে সেই ধর্ম সম্পর্কে জানা বা বোঝা ভুল হবে।কারন বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা বিভক্ত হয়ে গেছে, সব ধর্মের মধ্যে অনেক ভাগ হয়ে গেছে।এজন্য কোন ধর্ম সঠিক এবং সে ধর্মানুসারীরা সঠিক ভাবে ধর্ম পালন করছে কি না সেটা জানা বা বোঝা যায় সেই ধর্মের উৎস থেকে অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ থেকে।

ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের মূল উৎস

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَ اعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِیۡعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوۡا

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। (৩:১০৩)

এখানে আল্লাহর রজ্জু বলতে পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আরো বলেছেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِیۡعُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ اُولِی الۡاَمۡرِ مِنۡکُمۡ

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। (৪:৫৯)

ইসলামকে ভালোভাবে বুঝতে হলে পবিত্র কুরআন এবং সহিহ হাদিস (শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা এবং জীবনাচরণ) বুঝতে বা জানতে হবে।

হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র ও মৌলিক উৎস গুলো হলো বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, ভগবদ্ গীতা, পুরাণ ইত্যাদি।

ইসলামের পরিচিতি

ইসলাম একটি আরবি শব্দ যা سلم (সাল্ম) এবং سلم (সিল্ম) শব্দ থেকে এসেছে। سَلْمُ অর্থ শান্তি এবং سِلْمُ অর্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা। সংক্ষেপে ইসলাম অর্থ হচ্ছে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা) কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করার মাধ্যমে শান্তি লাভ করা। কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে ইসলাম কথাটির উল্লেখ রয়েছে। যেমন- সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯ এবং ৮৫।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট মনোনিত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা"।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে যে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে সে-ই মুসলিম। কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে মুসলিম কথাটির উল্লেখ রয়েছে। যেমন: সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৪ এবং সূরা ফুস্সিলাত, আয়াত ৩৩।

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ: "তোমরা সাক্ষী থাক নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান"।

ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা

অনেকেরই একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে ইসলাম একটি নতুন ধর্ম যা এসেছে ১৪০০ বছর আগে এবং যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আমি এখানে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে ইসলাম কোনো নতুন ধর্মের নাম নয়, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন এবং এই যুক্তিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (সা.) ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় না। কুরআনের বর্ণনা মতে, আল্লাহ্ ইসলামকে (মানুষের একমাত্র সৃষ্টিকর্তার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ) একমাত্র ধর্মবিশ্বাস ও জীবনবিধান হিসেবে সৃষ্টির শুরু থেকেই মানবজাতির কাছে প্রেরণ করেছেন। হযরত নূহ (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত

ইসহাক (আ.), হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-সহ যেসব নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে আগমন করেছেন তারা সকলেই একই বিশ্বাস এবং বাণী প্রচার করেছেন, যার মধ্যে আছে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (নবুওয়ত) এবং আখিরাত (মৃত্যুর পরের জীবন)। আল্লাহর এসকল নবী- রাসূলগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক নন। তারা প্রত্যেকেই তাদের পূর্বসূরিদের বাণী ও বিশ্বাস প্রচার করেছেন।

যাহোক, মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আল্লাহর শেষ নবী ও রাসূল। আল্লাহর সব রাসূলগণ যে সত্য দ্বীন প্রচার করেছেন সেই একই দ্বীনকে আল্লাহ তার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। এই সত্যবাণীকে বিভিন্ন যুগের মানুষ বিকৃত করে। এতে বাইরের বাণী আরোপ করে এবং এতে অন্যকথার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সত্য দ্বীনকে নানা ধর্মে বিভক্ত করা হয়। আল্লাহ এসব বাইরের উপাদান নির্মূল করেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) মাধ্যমে ইসলামকে এর বিশুদ্ধ ও প্রকৃতরূপে মানবজাতির নিকট প্রেরণ করেন।

(রেফারেন্স: ডা. জাকির নায়েকের লেকচার)

হিন্দু ধর্মের পরিচিতি

ক. ইতিহাসবিদগণ বলেন, হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশকারী পারস্যবাসীরাই প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। আরবরাও হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করতেন।

খ. এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিওনস এন্ড এথিক্স ৬:৬৯০ অনুসারে ভারতে মুসলমান আগমনের আগে ভারতীয় সাহিত্য বা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর কোথাও Ôহিন্দু' শব্দটির উল্লেখ ছিল না।

গ. সংক্ষেপে বলতে গেলে হিন্দু হলো একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা বা শব্দ যা দিয়ে সিন্ধু নদের তীরে বসবাসকারী মানুষদের তথা ভারতবর্ষে বসবাসকারী মানুষদের বোঝানো হত।

হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা:

ক. হিন্দু শব্দটি থেকে হিন্দুধর্ম শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ২০:৫৮১ অনুসারে উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষায় হিন্দু শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়, যা দিয়ে ইংরেজরা সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসকে বোঝাতো। ১৮৩০ সালে ইংরেজ লেখকরা মুসলমান ও খ্রিস্টান ছাড়া ভারতবর্ষের সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষকে বোঝাতে হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্ববাদ শব্দটি ব্যবহার করে।

খ. হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্ববাদ মূলত নামের ভুল প্রয়োগ। তাদের মতে, 'হিন্দুধর্ম'- কে বলা উচিত 'সনাতন ধর্ম' যার অর্থ চিরন্তন ধর্ম, অথবা 'বৈদিক ধর্ম' যার অর্থ বেদের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, এই ধর্মের অনুসারীদের 'বেদানুসারী' বলে পরিচয় দেওয়া উচিত।

ইসলামে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা

পবিত্র কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা ইখলাসের ১-৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ সম্পর্কে সবচেয়ে চমৎকার ও যথার্থ ধারণা প্রদান করা হয়েছে:

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْوَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

"বল, তিনি আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়; আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ; তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং কাহারো কাছ থেকে জন্ম নেন নাই; এবং তাহার সমতুল্য কেহ নাই।"

'আস সামাদ' শব্দের অর্থ আল্লাহর অস্তিত্বই কেবল অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী আর সব কিছুই নশ্বর বা অস্থায়ী। এর আরো একটি অর্থ হল আল্লাহ্ কারো ওপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু সকল ব্যক্তি ও বস্তু তার ওপর নির্ভরশীল।

কুরআনের ১৭ নম্বর সূরা- আল ইসরার ১১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ.

বল: ‘‘তোমরা ‘আল্লাহ' নামে আহ্বান কর বা ‘রাহমান' নামে আহ্বান কর; তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তারই"।

আপনি আল্লাহকে যে কোনো নামে ডাকতে পারেন কিন্তু তা হতে হবে সুন্দর এবং তা আপনার মানসপটে আল্লাহর কোন ছবি তুলে ধরবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ৯৯ টি ভিন্ন ভিন্ন গুণবাচক নাম রয়েছে। এগুলোর কয়েকটি হলো আর-রাহমান, আর-রাহিম, আল-হাকিম- অর্থ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু এবং সর্বজ্ঞ। আল্লাহর বহু গুণবাচক নামের মধ্যে যে নামটি দিয়ে তাঁর সবগুণ ধারণ করে তাঁকে বোঝানো যায় সে নামটি হলো 'আল্লাহ্'। আল্লাহ্ যে সবচেয়ে সুন্দর নামগুলোর অধিকারী কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তা বলা হয়েছে। আল কুরআনের ৭নং সূরা আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

‘‘আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সকল নামেই ডাক, আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে শীঘ্রই দেয়া হবে"।

আল কুরআনের ২০ নং সূরা ত্বহার ৮ নং আয়াতের বলা হয়েছে-

الله لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই"।

আল কুরআনের ৫৯ নং সূরা হাশরের ২৩ এবং ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে-

‘‘তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতিব মহামান্বিত। তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান"। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’’।

হিন্দু ধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা

সৃষ্টিকর্তার ধারণার ক্ষেত্রেও আপনি হিন্দু ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে মিল খুঁজে পাবেন। উপনিষদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি।

১. ছান্দোগ্য উপনিষদ অধ্যায় ৬, সেকশন ২, শ্লোক ১।

"ইকাম ইভানদ্বিতীয়াম"

তিনি এক, যার কোনো দ্বিতীয় নেই।

(এস. রাধাকৃষ্ণ রচিত প্রধান উপনিষদ, পৃষ্ঠা ৪৪৭ এবং ৪৪৮) (স্যাক্রিড বুকস অব দি ইস্ট, খণ্ড ১, উপনিষদ পর্ব ১, পৃষ্ঠা ৯৩)

২. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৬, শ্লোক ৯

"তার কোনো পিতামাতা নেই বা প্রভু নেই।"

(এস. রাধাকৃষ্ণ রচিত প্রধান উপনিষদ, পৃষ্ঠা ৭৪৫

(স্যাক্রিড বুকস অব দি ইস্ট, খণ্ড ১৫, উপনিষদ পর্ব ২, পৃষ্ঠা ২৬৩)

৩. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৪, শ্লোক ১৯

"ন তস্য প্রতিমা আস্তি"

তার মত কেউ নেই।

(এস. রাধাকৃষ্ণ রচিত প্রধান উপনিষদ, পৃষ্ঠা ৭৩৬ এবং ৭৩৭) (স্যাক্রিড বুকস অব দি ইস্ট, খণ্ড ১৫, উপনিষদ, পর্ব ২, পৃষ্ঠা ২৫৩)

৪. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৪, শ্লোক ২০

"তার আকৃতি দেখা যায় না, কেউ তাকে চোখে দেখতে পায় না।"

(এস. রাধাকৃষ্ণ সম্পাদিত/অনূদিত প্রধান উপনিষদ, পৃষ্ঠা ৭৩৭) (স্যাক্রিড বুকস অব দি ইস্ট, খণ্ড ১৫, উপনিষদ পর্ব ২, পৃষ্ঠা ২৫৩)

হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল ভগবদ্গীতা। ভগবদ্গীতায় ৭:২০ উল্লেখ আছে,"জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে চুরি করেছে তারাই মানুষের গড়া স্রষ্টার পূজা করে।" অর্থাৎ "যারা বস্তুবাদী, তারাই মানুষের গড়া স্রষ্টা অর্থাৎ সত্য সৃষ্টিকর্তাকে ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করে।"

ভগবদ্গীতায় ১০:৩ উল্লেখ আছে,

"তিনিই সে যে আমাকে জানেন অজাত, অনাদি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে।"

সকল হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে বেদকে সবচেয়ে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। বেদকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয়ঃ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ।

১. যজুর্বেদ, অধ্যায় ৩২, শ্লোক ৩

"ন তস্য প্রতিমা আস্তি" তার কোনো প্রতিকৃতি নেই।

এতে আরো বলা হয়েছে,

তিনি অজাত, তিনি আমাদের উপাসনা পাবার যোগ্য। (যজুর্বেদ ৩২:৩)

(দেবি চাঁদ এম.এ. সম্পাদিত যজুর্বেদ, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

২. যজুর্বেদ, অধ্যায় ৪০, শ্লোক ৮

"তিনি কায়াহীন ও বিশুদ্ধ"

(রালফ টি. এইচ. গ্রিফিথ সম্পাদিত যজুর্বেদ সংহিতা, পৃষ্ঠা ৫৩৮)

৩. যজুর্বেদ, অধ্যায় ৪০, শ্লোক ৯

"অন্ধত্ব প্রবিশান্তি ইয়ে অসমভূতি মুনাস্তে"

"তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, যারা প্রাকৃতিক বস্তু পূজা করে।"

প্রাকৃতিক বস্তু যথা, বায়ু, পানি, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি। এখানে আরো বলা আছে: "যারা সম্ভূতি অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুর যথা, টেবিল, চেয়ার, মূর্তি প্রভৃতির পূজা করে, তারা

অন্ধকারের আরো বেশি গভীরে ডুবে যায়।" (রালফ টি. এইচ. গ্রিফিথ সম্পাদিত যজুর্বেদ সংহিতা, পৃষ্ঠা ৫৩৮)

১. অথর্ববেদ, বই ২০, স্তবক (অধ্যায়) ৫৮, শ্লোক ৩.

"দেব মহা ওসি"

"নিশ্চয় ভগবান মহান"

(উইলিয়াম ডুরাইট হোয়াটনি সম্পাদিত অথর্ববেদ সংহিতা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯১০)

১. ঋগ্বেদ, বই ১, স্তবক ১৬৪, শ্লোক ৪৬.

"ইকাম সাত বিপরা বহুধা বদান্তি"

"জ্ঞানী পুরোহিতরা এক ঈশ্বরকে বহু নামে ডাকেন।"

সত্য এক, ঈশ্বর এক, জ্ঞানী পুরোহিতরা তাঁকে নানা নামে ডাকেন। একই ধরনের বার্তা পাওয়া যায় ঋগ্বেদ, বই ১০, স্তবক ১১৪, শ্লোক ৫।

২. ঋগ্বেদ, বই ২, স্তবক ১

ঋগ্বেদে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে অন্তত ৩৩টি গুণাবলিতে ভূষিত করা হয়েছে।

এসব গুণাবলির বেশ কয়েকটি ঋগ্বেদ, বই ২, স্তবক ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. ব্রহ্মা = সৃষ্টিকর্তা = খালিক (ঋগ্বেদ বই ২, স্তবক ১, শ্লোক ৩)

ঋগ্বেদে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার যেসব গুণাবলি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম সুন্দর অভিধা হল ব্রহ্মা। ব্রহ্মা শব্দের অর্থ হল সৃষ্টিকর্তা। আপনি যদি একে আরবিতে অনুবাদ করেন, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে খালিক। কেউ যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহকে খালিক বা সৃষ্টিকর্তা বা ব্রহ্মা বলে ডাকেন, তাহলে ইসলাম এতে কোনো আপত্তি জানাবে না। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে বন্ধা অর্থাৎ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার চারটি মাথা আছে, যার প্রতিটিতে মুকুট আছে এবং এই ব্রহ্মার চারটি হাত আছে- তাহলে ইসলাম এতে

প্রবল আপত্তি জানাবে। কারণ এধরনের বর্ণনা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার আকৃতি তুলে ধরে।

এধরনের বর্ণনা যজুর্বেদের অধ্যায় ৩২, শ্লোক ৩-উল্লিখিত বর্ণনারও পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে:

"ন তস্য প্রতিমা আস্তি"

তার কোনো প্রতিকৃতি নেই।

খ. বিষ্ণু = পালনকর্তা = রব

(ঋগ্বেদ বই ২, স্তবক ১, শ্লোক ৩)এ উল্লিখিত আরেকটি সুন্দর অভিধা হল বিষ্ণু। বিষ্ণু অর্থ হল পালনকর্তা/প্রতিপালক। আপনি এই শব্দকে আরবিতে অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়ায় রব। কেউ যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহকে রব বা পালনকর্তা/প্রতিপালক বা বিষ্ণু বলে ডাকেন, তাহলে ইসলাম এতে কোনো আপত্তি জানাবে না। কিন্তু কেউ যদি বলেন বিষ্ণু সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যার চারটি হাত আছে এবং তাঁর ডান হাতে ধরা আছে চক্র বা চাকা এবং বাম হাতে রয়েছে শঙ্খ। বিষ্ণু পক্ষীতে বিহার করেন এবং সর্পাসনে বিশ্রাম করেন। তাহলে ইসলাম এতে প্রবল আপত্তি জানাবে। কারণ বিষ্ণুর এধরনের বর্ণনা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার আকৃতি তুলে ধরে। এধরনের বর্ণনা যজুর্বেদের অধ্যায় ৪০, শ্লোক ৮- উল্লিখিত শিক্ষারও পরিপন্থী।

৩. ঋগ্বেদ, বই ৮, স্তবক ১, শ্লোক ১

"তিনি, পূত-পবিত্র, তিনি ব্যতীত আর কারো উপাসনা করো না, শুধু তাঁর স্মৃতি করো।"

(স্বামী সত্যপ্রকাশ সরস্বতি এবং সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১ ও ২)

৪. ঋগ্বেদ, বই ৫, স্তবক ৮১, শ্লোক ১

"পূত-পবিত্র সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব নিশ্চয়ই মহান।" (স্বামী সত্যপ্রকাশ সরস্বতি এবং সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৮০২ ও ১৮০৩)

৫. ঋগ্বেদ, বই ৬, স্তবক ৪৫, শ্লোক ১৬

"শুধুমাত্র তাঁরই স্তুতি করো যিনি তুলনাহীন ও একক।"

(রালফ টি. এইচ. গ্রিফিথ সম্পাদিত ঋগ্বেদের স্তবকমালা, পৃষ্ঠা ৬৪৮)

হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র হলো:

"ইকাম ব্রাহ্ম, দেবিত্ব নাস্তে নেহ না নাস্তে কিঞ্চন।"

"সৃষ্টিকর্তা কেবল একজনই, আর কোনো উপাস্য নেই, আদৌ নেই, কখনো না, একদমই না।"

হিন্দুধর্ম গ্রন্থ থেকে ওপরে উদ্ধৃত সকল শ্লোক ও অনুচ্ছেদ স্পষ্টতই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব প্রকাশ করে। এছাড়াও, এসকল শ্লোক ও অনুচ্ছেদে একক ও সত্য স্রষ্টা ব্যতীত অন্য সকল দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার ও বাতিল করে। এসকল শ্লোকে একেশ্বরবাদকেই তুলে ধরে। সেজন্য কেউ যদি মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে হিন্দুধর্ম গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহলে তিনি হিন্দুত্ববাদে স্রষ্টার সঠিক ধারণা বুঝতে পারবেন এবং উপলব্ধি করতে পারবেন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ্ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে

'আল্লাহ', আরবিতে যার অর্থ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, শব্দটি নিম্নোক্ত স্থানে উল্লেখ আছে:

ঋগ্বেদ, বই ২, স্তবক ১, শ্লোক ১১

ঋগ্বেদ, বই ৩, স্তবক ৩০, শ্লোক ১০

ঋগ্বেদ, বই ৯, স্তবক ৬৭, শ্লোক ৩০ আলো উপনিষদ নামে একটি উপনিষদও আছে।

হিন্দুধর্ম ও ইসলামে আল্লাহর বাণী বা ঐশ্বরিক বাণী (ওহি) সম্পর্কে ধারণা

ইসলামে আল্লাহর বাণী (ওহি) সম্পর্কে ধারণা

১) আল্লাহ্ (সুবহানাহু তা'আলা) প্রত্যেক যুগেই ওহি নাযিল করেছেন বা আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন:

"প্রত্যেক যুগেই আসমানি কিতাব প্রেরণ করা হয়েছে।" (সূরা রা'দ, আয়াত ৩৮)

২) কুরআনে চারটি আসমানি কিতাবের নাম রয়েছে:

বিভিন্ন যুগে ওই যুগের মানুষকে হেদায়েত বা দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) বেশ কিছু আসমানি কিতাব নাযিল করেন। কুরআনে কেবল চারটি আসমানি কিতাবের নামের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো: যাবুর, তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন, যার সবগুলোই ওহি বা আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যাদেশ। যাবুর হযরত দাউদের (আ.) ওপর নাযিল হয়েছে এবং তাওরাত হযরত মুসার (আ.) ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইনজিল নাযিল হয়েছে হযরত ঈসার (আ.) ওপর এবং কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ওহি যা অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদের (সা.) ওপর।

৩) পূর্ববর্তী সব আসমানি কিতাব একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য এবং একটি বিশেষ সময়কালের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানি কিতাব একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য ও কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল।

৪) কুরআন যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব, তাই কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। এটি কেবল মুসলমান বা আরব জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়নি বরং এটি সমগ্র মানবজাতির জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিল। অধিকন্তু কুরআন কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) সময়কালের জন্য অবতীর্ণ হয় নাই বরং কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

ক. পবিত্র কুরআনের ১৪ নম্বর সূরা ইবরাহীমের ১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"আলিফ-লাম্-রা, এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানবজাতিকে তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বাহির করিয়া আনিতে পার অন্ধকার হইতে আলোকে, তাঁহার পথে যিনি পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিত"

যেহেতু বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত এটিই চূড়ান্ত ওহি তাই এটিকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করার বিষয়টি অগ্রাহ্য করার কোন উপায় নেই। পবিত্র কুরআনেও এ ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে:

"আমিই (নিঃসন্দেহে) কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্যই আমিই উহার সংরক্ষক (যে কোন ধরনের বিকৃতি থেকে)।" (সূরা আল হিজর আয়াত- ৯)

খ. কুরআনের ১৪ নম্বর সূরা ইবরাহীমের ৫২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

هُذَا بَلَغَ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَّاحِدٌ وَلِيَذْكُرَأُولُوا الْأَلْبَابِ.

"ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে তিনিই একমাত্র ইলাহ্ এবং যাহাতে বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে"।

গ. কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

"রামাযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নির্দশন এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে"।

ঘ. কুরআনের ৩৯ নম্বর সূরা যুমারের ৪১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য"।

আল কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। এটি ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ, যা ইংরেজি ষষ্ঠ শতকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী মুহাম্মদের (সা.) ওপর নাজিল হয়েছে।

৫) পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে এবং অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থগুলোতে পবিত্র কুরআনের উল্লেখ করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী সকল কিতাব ও বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ্ এই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের কথা উল্লেখ ছিলো। (২৬:১৯৬)

৬. আল হাদীস: কুরআন ছাড়া ইসলামের অন্য পবিত্র গ্রন্থটি হলো হাদীস অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) বাণী ও জীবনাচরণ। এসব হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের সম্পূরক। এগুলো কুরআনের কোন শিক্ষাকে বাতিল করতে পারে না এবং কুরআনের বিপরীত কোন কথা বলতে পারে না।

হিন্দুধর্ম গ্রন্থ

হিন্দুধর্মে দুই ধরনের পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে: শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি অর্থ যা শোনা হয়েছে, উপলব্ধি করা হয়েছে, বোঝা গেছে বা প্রকাশ করা হয়েছে। এটি হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ও প্রাচীন। শ্রুতি দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত: বেদ ও উপনিষদ। মনে করা হয় এগুলো ঈশ্বরের বাণী। স্মৃতি শ্রুতির মত এত পবিত্র নয়। তথাপি এটিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং আজকাল হিন্দুদের মধ্যে এটি বেশ জনপ্রিয়। স্মৃতি অর্থ মনে রাখা। এই হিন্দু সাহিত্য বোঝাটা সহজ, কেননা এটি জগতের সত্যগুলোকে প্রতীক ও পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরে। স্মৃতিকে ঈশ্বরের বাণী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না বরং মানুষের রচিত কাহিনী হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া হয়। স্মৃতি ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের ও সমাজের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করে যা তাদের প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এগুলো ধর্মশাস্ত্র নামেও পরিচিত। স্মৃতির মধ্যে পুরাণ ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন ধরনের লেখা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হিন্দুদের বেশ কিছু ধর্মগ্রন্থ রয়েছে; এগুলোর মধ্যে রয়েছে বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণ।

১. বেদ

ক) 'বেদ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'বিদ' থেকে এসেছে যার অর্থ জানা। সুতরাং 'বেদ'

শব্দটির অর্থ হলো সর্বোত্তম জ্ঞান বা পবিত্র জ্ঞান। বেদের চারটি প্রধান ভাগ রয়েছে। (সংখ্যা অনুসারে এগুলোর সংখ্যা ১১৩১ হলেও এগুলোর মধ্যে ডজনখানেক পাওয়া যায়। পতাঞ্জলির মহাভাষ্য মতে, ২১ ধরনের ঋগ্বেদ, ৯ ধরনের অর্থর্ববেদ, ১০১ ধরনের যজুর্বেদ এবং ১০০০ ধরনের সামবেদ রয়েছে।)

খ) ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদকে সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি 'ত্রিবিদ্যা' বা 'ত্রিবিজ্ঞান' হিসেবে পরিচিত। ঋগ্বেদ সবচেয়ে প্রাচীন এবং তিনটি দীর্ঘ ও পৃথক সময়কে এটি একত্রিত করেছে। ৪র্থ বেদটি হলো অথর্ববেদ যা পরবর্তীতে এসেছে।

-ঋগ্বেদে প্রধানত রয়েছে প্রশংসা গীত।

-যজুর্বেদে আছে আত্মত্যাগের কথা।

-সামবেদে রয়েছে সুমিষ্ট গীত।

-অথর্ববেদে রয়েছে বেশকিছু যাদুমন্ত্র।

গ) চারটি বেদ সংকলিত বা প্রকাশিত হবার দিনতারিখ সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত মতামত জানা যায় না। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের মতে, ১৩১ কোটি বছর পূর্বে বেদ প্রকাশিত হয়েছিল এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে এগুলোর বয়স ৪০০০ বছরের বেশি হবে না।

ঘ) তেমনি কোন্ স্থানে এগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল এবং কোন্ ঋষিদের ওপর এগুলো অবতীর্ণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। এ ধরনের মতবিরোধ সত্ত্বেও বেদকে হিন্দুধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ও আসল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. উপনিষদ

ক) উপনিষদ শব্দটি এসেছে 'উপ' যার অর্থ 'কাছে', 'নি' যার অর্থ 'নিচে' এবং 'ষদ' যার অর্থ 'বসা'--এই তিনটি শব্দ থেকে। সুতরাং উপনিষদ শব্দটির অর্থ কাছে নিচে

বসা। একদল শিষ্য গুরুর কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য গুরুর নিকটে বসে থাকে। সঙ্কর অনুসারে, উপনিষদ মূল শব্দ 'সদ' থেকে এসেছে যার অর্থ 'ঢিলা দেওয়া', 'পৌঁছানো' বা 'ধ্বংস করা', 'উপ' এবং 'নি' হচ্ছে উপসর্গ। সুতরাং উপনিষদ অর্থ 'ব্রহ্মজ্ঞান' যার মাধ্যমে অজ্ঞতাকে ধ্বংস করা যায়। ২০০টিরও বেশি উপনিষদ রয়েছে, যদিও ভারতীয় ঐতিহ্য একে ১০৮-এ সীমাবদ্ধ রেখেছে। ১০টি মূল উপনিষদ রয়েছে, যদিও অনেকে মনে করেন এদের সংখ্যা ১০-এর বেশি, অন্যদিকে অন্যান্যরা বলেন ১৮টি।

খ) বেদান্ত বলতে উপনিষদকেই বোঝায়, যদিও এ শব্দটি এখন উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে যে দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। আক্ষরিক অর্থে, বেদান্ত অর্থ বেদের শেষ, বেদস্য-অন্ত, বেদের উপসংহার এবং বেদের লক্ষ্য। বেদের সমাপ্তি অংশগুলোই হলো উপনিষদ এবং তা বৈদিক যুগের শেষের দিকেই এসেছে।

গ) কিছু পণ্ডিত উপনিষদকে বেদের চাইতে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মনে করে।

৩. ইতিহাস-মহাকাব্য

হিন্দুধর্মের দু'টি ইতিহাস বা মহাকাব্য রয়েছে। একটি হলো রামায়ণ এবং অপরটি মহাভারত।

ক) রামায়ণ একটি মহাকাব্য যা রামের জীবনগাঁথা বর্ণনা করে। অধিকাংশ হিন্দুই রামায়ণের কাহিনী জানে।

খ) মহাভারত আরেকটি অসাধারণ মহাকাব্য, যেখানে চাচাতো ভাই- পাণ্ডব ও কৌরবের মধ্যে বিবাদ দেখানো হয়। এতে কৃষ্ণের জীবন কাহিনীও রয়েছে। মহাভারতের কাহিনীও অধিকাংশ হিন্দুই জানে।

৪. ভগবদ্গীতা

হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে ভগবদ্গীতা সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সুপরিচিত গ্রন্থ। এটি মহাকাব্য মহাভারতের একটি অংশ এবং এতে বিশ্বমা পর্বের অধ্যায় ২৫ থেকে ৪২ পর্যন্ত ১৮টি অধ্যায় রয়েছে। এতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের ময়দানে যে উপদেশ দিয়েছিল তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৫. পুরাণ

শুদ্ধতার ক্রমানুসারে এরপর আসে পুরাণ, যা সবচাইতে বেশি পঠিত গ্রন্থ। পুরাণ শব্দের অর্থ হলো প্রাচীন। পুরাণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইতিহাস, আর্যজাতির আদি ইতিহাস এবং হিন্দু দেব-দেবীদের জীবন ইতিহাস রয়েছে। বেদের মতই পুরাণও অবতীর্ণ গ্রন্থ, যেগুলো বেদের সাথে একই সময়ে বা কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। মহাঋষি ব্যাস পুরাণকে ১৮টি বিশাল বিশাল খণ্ডে ভাগ করেছেন। পুরাণগুলোর মধ্যে প্রধান গ্রন্থটি হলো ভবিষ্য পুরাণ। এটিকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয় কারণ এতে ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে পূর্বাভাস রয়েছে। ভবিষ্য পুরাণকে হিন্দুরা ঈশ্বরের বাণী মনে করে। মহাঋষি ব্যাসকে মনে করা হয় এই গ্রন্থগুলোর সংকলক হিসেবে এবং প্রকৃত রচয়িতা মনে করা হয় ভগবানকে।

৬. অন্যান্য গ্রন্থ

হিন্দুদের আরো অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, যেমন, মনুস্মৃতি ইত্যাদি।

৭. সবচেয়ে শুদ্ধ হিন্দুধর্মগ্রন্থ হল বেদ

হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে বেদকে শুদ্ধতম গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়। কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থই বেদকে বাতিল করে না। হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, বেদ ও অন্য হিন্দুধর্ম গ্রন্থের মধ্যে যদি কোন বিরোধ বা বৈপরিত্য দেখা দেয় তাহলে বেদের মতই গ্রহণ করা হবে।

হিন্দুধর্ম ও ইসলামে নবুওয়তের ধারণা

ক) ইসলামে নবী-রাসূল সর্বশক্তিমান আল্লাহর দূত বা নবীগণ হলেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ যাঁরা মানুষের কাছে মহান আল্লাহ তা'আলা বাণী পৌঁছে দেন।

প্রত্যেক জাতির কাছেই নবী-রাসূল পাঠানো হয়েছে

ক. কুরআনের ১০ নম্বর সূরা ইউনুসের ৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন:

‘‘প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন উহাদের রাসূল আসিয়াছে তখন ন্যায়বিচারের সহীত উহাদের মীমাংসা হইয়াছে এবং উহাদের প্রতি জুলুম করা হয় নাই।"

খ. কুরআনের ১৬ নম্বর সূরা নাহলের ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন:

আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে।’’

গ. কুরআনের ৩৫ নম্বর সূরা ফাতিরের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন:

‘‘এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সর্তককারী প্রেরিত হয় নাই।’’

ঘ. কুরআনের ১৩ নম্বর সূরা রা'দের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ (সুবহানু ওয়া তা'আলা) বলেছেন:

‘‘এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথপ্রদর্শক।’’

কুরআন ও হাদীসে কিছু কিছু রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে:

হযরত আদম (আ.), হযরত শীস (আ.), হযরত ইদ্রিস (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত হূদ (আ.), হযরত সালেহ (আ.), হযরত লুত (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত শোয়েব (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত আল ইয়াসা (এলিশা) (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত আজিজ (উজায়ের বা এজরা) (আ.), হযরত আইয়ুব (আ.), হযরত জুলকিফ্ল (আ.), হযরত ইউনুস (আ.), হযরত জাকারিয়া (আ.), হযরত ইয়াহিয়া (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআনে কেবল কয়েকজন নবী-রাসূলের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে:

ক. কুরআনের ৪ নম্বর সূরা নিসার ১৬৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

“অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যাহাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূল ছিলেন, যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই এবং মূসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।”

খ. কুরআনের ৪০ নম্বর সূরা গাফিরের ৭৮ আয়াতে বলা হয়েছে:

"আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম, আমি তাহাদের কাহারো কাহারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং কাহারো কাহারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নাই"।

আল্লাহ ১,২৪,০০০ নবী প্রেরণ করেছেন মিশকাতুল মাসাবিহ-এর ৩য় খণ্ড হাদীস নম্বর ৫৭৩৭, আহমদ বিন হাম্বাল, ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৬- এর সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে:

“আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) ১,২৪,০০০ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।”

পূর্ববর্তী রাসূলদের কেবল তাদের স্বজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পূর্বে যত নবী-রাসূল এসেছেন তাদের সবাইকে তাদের নিজ নিজ জনগোষ্ঠী ও স্বজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তারা যে বাণী প্রচার করে তা কেবল ওই যুগের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছিল।

মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসূল

কুরআনের ৩৩ নম্বর সূরা আল আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

“মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।”

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে

ক. যেহেতু মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী ও রাসূল, তাই তাকে কেবল মুসলমান বা আরবদের জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য

প্রেরণ করা হয়েছে। কুরআনের ২১ নম্বর সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে:

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।”

খ. পবিত্র কুরআনের ৩৪ নম্বর সূরা সাবার ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

“আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।”

গ. সহীহ বুখারি প্রথম খণ্ড, সালাত সম্পর্কিত পাঠ, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ৪২৯-তে বলা হয়েছে,

“আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে কেবল স্বজাতির কাছে পাঠানো হয়েছে কিন্তু আমাকে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।"

হিন্দুধর্মে অবতার ও দূত

১. সাধারণ হিন্দুদের মতে অবতার

ক. সাধারণ হিন্দুদের অবতার সম্পর্কে ধারণা এখানে বলা হল। অবতার একটি সংস্কৃত শব্দ যেখানে 'অব' অর্থ 'নিচে' এবং 'তর' অর্থ 'নামা'। সুতরাং অবতার অর্থ নিচে নামা

বা নিচে নেমে আসা। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে অবতার শব্দের অর্থ, “(হিন্দু পুরাকাহিনীতে) কোন দেবতা বা মুক্ত আত্মার রক্তমাংশের শরীর নিয়ে পৃথিবীতে আগমন।” সহজ কথায়, সাধারণ হিন্দুদের মতে অবতার হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মানুষের রূপে দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আগমন।

সাধারণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে, ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বা মানবজাতির জন্য বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রক্তমাংসের শরীর নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন। হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্রগ্রন্থ শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত বেদের কোথাও অবতার কথাটির উল্লেখ নেই। তবে স্মৃতিতে অর্থাৎ পুরাণ ও ইতিহাসে এর উল্লেখ রয়েছে।

খ. হিন্দুদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ব্যাপক পঠিত বইয়ে উল্লেখ রয়েছে

১) ভগবদ্গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৭-৮:

"যেখানেই ন্যায়ের অবক্ষয় দেখা দেয়, হে ভরত, এবং অন্যায়-অবিচার বেড়ে যায়, তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করি। শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি প্রত্যেক যুগেই জন্মগ্রহণ করি।"

২) ভগবৎ পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে ৯:২৪:৫৬,

“যেখানেই ন্যায়ের অবক্ষয় এবং পাপের বৃদ্ধি ঘটে, সেখানেই মহান স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেন।"

২. বেদে ও ইসলামে কোন অবতার নয় বরং দূতের কথা উল্লেখ রয়েছে

ইসলাম বিশ্বাস করে না যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মানুষের রূপ ধারণ করেন। তিনি মানুষদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করেন এবং তার সাথে উচ্চতর পর্যায়ে যোগাযোগ করেন যিনি তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেন এবং তাকেই বলা হয় আল্লাহর রাসূল বা দূত।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি অবতার শব্দটি এসেছে ‘অব' এবং ‘‘তর' থেকে যার অর্থ নিচে নেমে আসা। কতিপয় পণ্ডিতের মতে ঈশ্বরের অবতার একটি সম্বন্ধপদ এবং এর প্রকৃত অর্থ ‘আল্লাহ্ তা’আলার সাথে বিশেষ সম্পর্ক রযেছে এমন ব্যক্তির আগমন।” চারটি বেদেরই বেশ কিছু জায়গায় ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত এসব ব্যক্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এভাবে আমরা যদি ভগবদ্গীতা ও পুরাণকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ্ বেদের সাথে তুলনা করি তাহলে আমাদেরকে মানতেই হবে যে যখন ভগবদ্গীতা ও পুরাণে অবতারের কথা বলা হয়, তখন ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়। ইসলামে তাদেরকেই নবী বলা হয়।

স্রষ্টার গুণাবলি

নরত্বারোপ (anthropomorphism) বা ঈশ্বরের মধ্যে মানব গুণ আরোপ

ক. মানুষকে বোঝার জন্য স্রষ্টার বা ঈশ্বরের মানুষের রূপ ধারণের প্রয়োজন নেই সেমিটীয় নয় এমন অনেক ধর্মেই কোন না কোন পর্যায়ে প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপের, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার মানুষের রূপ ধারণের দর্শনে বিশ্বাসের কথা বলা হয়। যারা এতে বিশ্বাস করে তাদের যুক্তির মধ্যে কমবেশি সাদৃশ্য রয়েছে। তারা বলে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এত শুদ্ধ ও পূত-পবিত্র যে তিনি মানুষের দুঃখকষ্ট, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, সমস্যা, অনুভূতি, স্নেহ-ভালোবাসা, আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। তিনি জানেন না যখন কোন মানুষ আঘাত পায় বা বিপদে পড়ে তখন সে কেমন অনুভব করে। সুতরাং মানুষের আচার-আচরণ ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে বিধিবিধান তৈরির জন্য সৃষ্টিকর্তা মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে আসেন। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের এটিকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

খ. পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা মানুষের জন্য কোনটি ভালো বা মন্দ তা জানতে আমাদের মহান প্রভু ও স্রষ্টা, আল্লাহকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মানুষের

রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসার প্রয়োজন হয় না। যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তার কেবল ব্যবহার নির্দেশিকা প্রদান করা প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এমন একটি নির্দেশিকা মানুষকে নিম্নোক্ত বিষয় অবগত করবে ও ব্যাখ্যা করবে: ১) মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২) কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে ৩) ইহ ও পারলৌকিক সাফল্য লাভের জন্য তাদের কি করা উচিত ও কি থেকে বিরত থাকা উচিত। সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশিকা হল পবিত্র কুরআন।

গ. আল্লাহ্ তাঁর দূত বা রাসূল নির্বাচিত করেন এ ব্যবহারবিধি লেখার জন্য স্বয়ং আল্লাহর পৃথিবীতে নেমে আসার প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের মধ্য থেকে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য একজনকে নির্বাচিত করেন এবং ওহির মাধ্যমে উচ্চতর পর্যায়ে তার সাথে যোগাযোগ করেন। এ ধরনের নির্বাচিত ব্যক্তিকেই বলা হয় আল্লাহর বাণী প্রচারক বা নবী। এসব নির্বাচিত মানবের কাছেই আল্লাহ তাঁর বাণী প্রেরণ করেন।

সৃষ্টিকর্তা মানুষের রূপ ধারণ করেন না এবং করবেনও না

ক. সৃষ্টিকর্তা সবকিছু করতে পারেন না

কেউ কেউ বলতে পারে যে সৃষ্টিকর্তা সবকিছু করতে পারেন, তাহলে তিনি মানুষের রূপ ধারণ করতে পারবেন না কেন? সৃষ্টিকর্তা যদি মানুষের রূপ ধারণ করেন তাহলে তিনি আর সৃষ্টিকর্তা থাকেন না। কেননা স্রষ্টার গুণাবলি আর মানুষের গুণাবলি ভিন্ন।

১) সৃষ্টিকর্তা অমর কিন্তু মানুষ মরণশীল

সৃষ্টিকর্তা অমর; মানুষ মরণশীল। আপনি কখনো 'ঈশ্বর-মানব' দেখতে পাবেন না অর্থাৎ একইসাথে একজন নশ্বর ও অবিনশ্বর হতে পারে না। এটা অর্থহীন। স্রষ্টার কোন আদি নেই। মানুষের আদি বা শুরু রয়েছে। আপনি এমন কোন ব্যক্তিকে পাবেন না যার একই সাথে আদি রয়েছে আবার আদি নেই। স্রষ্টার কোন অন্ত নেই। মানুষের

অন্ত বা শেষ রয়েছে। আপনি এমন কোন অস্তিত্ব পাবেন না যার একই সাথে অন্ত আছে আবার অন্ত নেই। এটি অর্থহীন।

২) সৃষ্টির্তার খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না

সর্বশক্তিমান আল্লাহর খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। মানুষের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। পবিত্র কুরআনের ৬ নম্বর সূরা আনয়ামের ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"তিনিই আহার্য দান করেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ আহার্য দান করে না"।

৩) সৃষ্টিকর্তার বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন হয় না

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। মানুষের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সৃষ্টিকর্তার ঘুমাবার প্রয়োজন হয় না। মানুষের ঘুমের প্রয়োজন হয়। পবিত্র কুরআনের আয়াতুল কুরসী, ২ নম্বর সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ বা উপাস্য নাই তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রয়েছে সমস্ত তাঁহারই..."।

খ. মানুষ হয়ে অন্যকোন মানুষকে উপাসনা করা পাপ

ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা যদি মানুষের রূপ ধারণ করেন, তাহলে তিনি আর ঈশ্বর থাকেন না এবং মানুষ হয়ে অন্য আরেকজন মানুষকে উপাসনা করা অর্থহীন। মনে করুন আমি একজন অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষকের ছাত্র এবং আমি নিয়মিত আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকি। দুর্ভাগ্যবশত তিনি একটি দুর্ঘটনায় পতিত হলেন এবং তার স্মৃতিভ্রম ঘটল। এরপরও তার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হবে আমার জন্য বোকামি। কারণ দুর্ঘটনার পর তার স্মৃতিতে পরিবর্তন আসার ফলে তিনি তার পূর্বের দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছেন। একইভাবে ঈশ্বর যখন তার ঐশ্বরিক গুণাবলি ত্যাগ করে আমার আপনার মত মানুষে রূপান্তরিত হন তখন আমরা কিভাবে

তার উপাসনা করব এবং তার কাছ থেকে ঐশ্বরিক সাহায্য প্রার্থনা করব? কোন ব্যক্তি যদি কোন মানুষের উপাসনা করে তবে অন্যরা কেন আপনাকে বা আমাদের আশপাশের অন্যান্য মানুষদের উপাসনা করে না?

গ. মানুষ ঈশ্বর হতে পারে না

একই সময়ে একই সত্তা মানুষ এবং ঈশ্বর হতে পারে না। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে তাই তিনি মানুষ নন। কারণ মানুষের কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই। ঈশ্বরকে যদি মরণশীল হতে হয়, যা মানুষের বৈশিষ্ট্য, তাহলে তিনি আর ঈশ্বর থাকেন না। কারণ ঈশ্বর অবিনশ্বর। পরবর্তীতে সেই মানুষ ঈশ্বর হতে পারে না। কারণ মানুষের পক্ষে ঈশ্বর হওয়া সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হত তাহলে আমি এবং আপনিও ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্জন করে ঈশ্বরে পরিণত হতে পারতাম। এ কারণেই ঈশ্বর কখনো মানুষের রূপ ধারণ করবেন না বা করতে পারেন না। কুরআন সব ধরনের নরত্বারোপের বিরোধী। নরত্বারোপ অযৌক্তিক।

ঘ. ঈশ্বর কখনো অনৈশ্বরিক কাজ করবেন না

ইসলাম বলে না যে আল্লাহ্ সবকিছুই করতে পারেন। ইসলাম বলে আল্লাহর সব কিছুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে। আসুন আমরা উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি সৃষ্টিকর্তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকার কারণেই সৃষ্টিকর্তা কিছু কিছু কাজ করতে পারেন না।

১) সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বর কখনো মিথ্যা কথা বলবেন না

ঈশ্বর কেবল ঐশ্বরিক কাজ করে থাকেন। তিনি কোন অনৈশ্বরিক কাজ করেন না। সৃষ্টিকর্তা কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। তাঁর মিথ্যা কথা বলার বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদানের কোনও ইচ্ছাও থাকতে পারে না। ঈশ্বর কখনোই মিথ্যা কথা বলবেন না বা বলতে পারেন না। কারণ মিথ্যা বলা ঈশ্বরের কাজ নয়। যে মুহূর্তে তিনি মিথ্যা কথা বলবেন সে মুহূর্ত থেকে তিনি আর ঈশ্বর থাকবেন না।

২) সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বর কখনো অন্যায়-অবিচার করবেন না

সৃষ্টিকর্তা কখনো অন্যায়-অবিচার করতে পারেন না বা কোন অন্যায় কাজ করার বা অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছাও পোষণ করতে পারেন না। তিনি কখনোই তা করবেন না এবং তিনি তা করতে পারেন না। কারণ অন্যায়-অবিচার করা স্রষ্টাসুলভ কাজ নয়। পবিত্র কুরআনের ৪ নম্বর সূরা নিসার ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম (অন্যায়-অবিচার) করেন না।"

যে মুহূর্তে তিনি যুলুম বা অন্যায় করবেন, সে মুহূর্ত থেকে তিনি আর ঈশ্বর থাকবেন না। অনুগ্রহ করে বুঝতে চেষ্টা করুন ঈশ্বর একই সাথে ঈশ্বর ও মানব হতে পারেন না!!! সৃষ্টিকর্তার একইসাথে তার ঐশ্বরিক গুণাবলি থাকবে আবার তার সৃষ্টি মানুষের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যও থাকবে তা হতে পারে না।

৩) সৃষ্টিকর্তা কোন ভুল করবেন না

নিখুঁত হওয়া সৃষ্টিকর্তার গুণ। তাঁর সৃষ্টি কখনই এ গুণ অর্জন করতে পারে না। আমরা ক্রমাগত উন্নতি করার বা নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করে যেতে পারি কিন্তু আমরা কখনই নিখুঁত হতে পারব না।

সুতরাং, সৃষ্টিকর্তা কি কখনো ভুল করতে পারেন? তিনি কখনোই ভুল করবেন না বা ভুল করতে পারেন না। মানুষ মাত্রই ভুল আছে। ভুল করা স্রষ্টাসুলভ কাজ নয়। পবিত্র কুরআনের ২০ নম্বর সূরার ত্বহার ৫২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"আমার প্রতিপালক কখনো ভুল করেন না, বিস্মৃত হন না।" যে মুহূর্তে তিনি ভুল করবেন সে মুহূর্তে তিনি আর সৃষ্টিকর্তা থাকবেন না।

৪) সৃষ্টিকর্তা কোন কিছু ভুলেন না

সৃষ্টিকর্তা কোন কিছু ভুলে যান না। কারণ ভুলে যাওয়া স্রষ্টাসুলভ কাজ নয়। পবিত্র কুরআনের ২০ নম্বর সূরা ত্বহার ৫২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"আমার প্রতিপালক ভুল করেন না, বিস্মৃত হন না।"

যে মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তা বিস্মৃত হবেন তখন তিনি আর সৃষ্টিকর্তা থাকবেন না।

ঙ. ঈশ্বর কেবল ঐশ্বরিক কাজ করেন

১) আল্লাহর সব কিছুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু জায়গায় বলা হয়েছে, যেমন, সূরা বাকারার ১০৬ নম্বর আয়াত:

"আল্লাহই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

আমাদের বোঝার জন্য ঐশ্বরিক জ্ঞান সম্পর্কিত এই বিবৃতির ওপর আরো বেশ কিছু জায়গায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে:

২ নং সূরা বাকারা: আয়াত ১০৯

২ নং সূরা বাকারা: আয়াত ২৮৪

৩ নং সূরা আলে ইমরান: আয়াত ২৯

১৬ নং সূরা নাহল: আয়াত ৭৭

৩৫ নং সূরা ফাতির: আয়াত ১

২) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন

পবিত্র কুরআনের ৮৫ নম্বর সূরা বুরুজের ১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।"

এখন আমি নিশ্চিত যে আপনি নিজেই বিনীত ও আন্তরিকভাবে স্বীকার করবেন যে ঈশ্বর কেবল ঐশ্বরিক কাজ করার ইচ্ছাই পোষণ করেন, তিনি কোন অনৈশ্বরিক কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন না। ভুলে যাওয়া, ভুল করা, ক্লান্ত হওয়া, ক্ষুধার্ত হওয়া, ঈর্ষান্বিত হওয়া এবং ঈশ্বরের ওপর এ ধরনের মানবসুলভ গুণাবলি আরোপের মাধ্যমে আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে আপনারা সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন? আপনারা কি মনে করেন আমরা মানুষেরা আল্লাহর ওপর এ ধরনের মানবিক গুণাবলি আরোপের

মাধ্যমে ঠিক কাজটি করছি? মূর্খ মানব সৃষ্টিকর্তার ওপর যেসব গুণাবলি আরোপ করে আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে সেসব থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দেয়াই আমাদের জন্য উত্তম ও সৎ পছন্দ।

পবিত্র কুরআনের ৫৯ নম্বর সূরা হাশরের ২৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র, মহান"।

হিন্দুধর্ম গ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ক. মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্য পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্য পুরাণে প্রতিসর্গ পর্ব ৩, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৩, শ্লোক ৫ থেকে ৮ তে বলা হয়েছে:

"একজন মালেছা (ভিন দেশের ভিন্ন ভাষাভাষী লোক) আধ্যাত্মিক শিক্ষক তাঁর সাথীদের নিয়ে আসবেন, তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ। রাজা (ভোজ) এই মহাদেব আরবকে (স্বর্গীয় গুণাবলি সম্পন্ন) 'পঞ্চগব্য' ও গঙ্গাজলে স্নান করাবার পর (অর্থাৎ সব পাপ থেকে পবিত্র করে) তাকে তার গভীর আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বললেন, "আমি আপনার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছি, হে মানবজাতির গৌরব, আরববাসী, আপনি শক্তি সংগ্রহ করেছেন শয়তানকে হত্যা করার এবং আপনি নিজেকে মালেছা বিরোধীদের থেকে সুরক্ষিত করেছেন।"

ভবিষ্যদ্বাণীতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

১) নবীর নাম মুহাম্মদ

২) সে হবে আরব; সংস্কৃত শব্দ মরুস্থল অর্থ বালুময় জমি বা মরুভূমি

৩) রাসূলের সাথী অর্থাৎ সাহাবাদের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) মত এত বেশি সাহাবি অন্যকোন রাসূলের ছিল না।

৪) তাঁকে মানবজাতির গৌরব (পার্বতিস নাথ) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ৬৮ নম্বর সূরা কালামের ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

“এবং তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"

এবং আবারো ৩৩ নম্বর সূরা আহযাবের ২১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

“তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।"

৫) তিনি শয়তানকে হত্যা করবেন অর্থাৎ মূর্তি পূজা ও সব ধরনের অনাচার 'নির্মূল করবেন।

৬) তাঁকে (রাসূল) তার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা হবে। কেউ কেউ বলেন, যে রাজা ভোজের কথা ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) আগমনের ৫০০ বছর পরে একাদশ শতকে বেঁচে ছিলেন এবং তিনি রাজা শালিবাহানের ১০ম প্রজন্ম ছিলেন। তারা বুঝতে পারেন না যে ভোজ নামের কেবল একজন রাজাই ছিলেন না। মিশরের রাজাদের ফেরাউন এবং রোমের সম্রাটদের বলা হত সিজার। তেমনি ভারতের রাজাদের ভোজ উপাধি দেয়া হয়েছিল। তাই ১১শ শতকের রাজা ভোজের আগেও আরো অনেক রাজা ভোজ এসেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাস্তবে পঞ্চগব্য এবং গঙ্গাজলে স্নান করেননি।

যেহেতু গঙ্গার জলকে পবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়, তাই গঙ্গার জলে স্নান করা অর্থ সব ধরনের পাপ ধুয়ে ফেলা বা সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া। এখানে ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন নিষ্পাপ অর্থাৎ 'মাসুম'।

খ. ভবিষ্য পুরাণে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্য পুরাণের প্রতিসর্গ পর্ব ৩, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০ থেকে ২৭ মহাঋষি ব্যাস ভবিষ্যদ্বাণী করেন,

"মালেছা আরবের সুপরিচিত ভূমিকে নষ্ট করেছে। আর্যধর্ম দেশটিতে পাওয়া যায় না। পূর্বেও একজন পথভ্রষ্টকারীর আবির্ভাব ঘটেছিল যাকে আমি হত্যা করেছি; সে এখন আবারো একজন শক্তিশালী শত্রু কর্তৃক প্রেরিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এই শত্রুদের সঠিক পথ ও দিকনির্দেশনা প্রদর্শনের জন্য সুপরিচিত মহামাদ (মুহাম্মদ), যাকে আমি ব্রহ্মার চরিত্রের গুণাবলি প্রদান করেছি, পিশাচদের সঠিক পথে আনতে ব্যস্ত রয়েছেন।

হে রাজা, আপনার বোকা পিশাচদের ভূমিতে যাবার প্রয়োজন নেই। আমার দয়ায় আপনি যেখানে আছেন সেখানেই আপনি পবিত্রতা লাভ করবেন। রাত্রিকালে, সেই স্বর্গীয় গুণাবলি সম্পন্ন, বিচক্ষণ ব্যক্তি, অপিশাচের ছদ্মবেশে রাজা ভোজকে বললেন, হে রাজা! আপনার আর্যধর্মকে সব ধর্মের ওপর স্থান দেয়া হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর পরমাত্মার আদেশ অনুসারে, আমি মাংসভোজীদের মজবুত ধর্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করব। আমার অনুসারীরা হবে খৎনা করা পুরুষ, টিকিবিহীন (তার মাথায়), দাঁড়িওয়ালা, আযানের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটাবে এবং সব হালাল জিনিস খাবে। সে শূকর ছাড়া আর সব জন্তুর মাংসই খাবে। তারা পবিত্র গাছগাছড়ার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে চাইবে না, বরং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা পবিত্রতা অর্জন করবে। বিধর্মী জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধের সময় তারা মুসলমান নামে পরিচিত হবে। আমি এই মাংসভোজী জাতির ধর্মের প্রবক্তা হব।"

হিন্দুধর্ম ও ইসলামে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ধারণা

হিন্দুধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন

১. হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মের ধারণা- মৃত্যুর পর আত্মার অন্য দেহে গমন বা পুনর্জন্ম লাভ অধিকাংশ হিন্দুই জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম লাভ- এই চক্রে বিশ্বাসী, যাকে বলা হয় 'সংসার'।

'সংসার' বা পুনর্জন্মের মতবাদ জন্মের পর আত্মার অন্য দেহে গমন বা আত্মার পুনরায় দেহ লাভের তত্ত্ব হিসেবেও পরিচিত। এই মতবাদ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। পুনর্জন্মের মতবাদ অনুসারে, এমনকি মানুষের জন্মের সময় থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্যের কারণ তার পূর্বজন্মের কর্মফল, অর্থাৎ গত জন্মে সে যা করেছে। যেমন, একটি শিশু যদি সুস্থ অবস্থায় জন্মায় এবং আরেকটি শিশু যদি প্রতিবন্ধী বা অন্ধ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তবে তার কারণ হিসেবে বলা হয় এটি তাদের পূর্বজন্মের কাজের ফল। যারা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে তারা যুক্তি দেখায় যে যেহেতু

এই জীবনে আমরা আমাদের সব কাজের প্রতিফল পাই না তাই একজনের কাজের পরিণতি ভোগ বা সুফল পাবার জন্য অন্য আরেকটি জীবন থাকতে হবে।

ক) ভগবদ্গীতার ২:২২- এ বলা হয়েছে,

“মানুষ যেমন পুরানো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে তেমনি আত্মাও পুরোনো ও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে।”

খ) বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৪:৪:৩-তেও পুনর্জন্মের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "শুঁয়োপোকা যেমন তৃণফলার চূড়ায় উঠলে নতুন তৃণফলায় আশ্রয় নেয় ঠিক তেমনি আত্মা দেহ ছাড়লে নতুন অস্তিত্বে আশ্রয় নেয়।"

২. কর্ম-কার্যকারণ বিধি

কর্ম অর্থ হল কাজ, ক্রিয়া, পদক্ষেপ বা কার্যক্রম এবং এ দিয়ে শুধু আমাদের দেহ যে কাজ করে তাই বোঝায় না বরং আমাদের মন যে কাজ করে তাও বোঝায়। কর্মের প্রকৃত অর্থ হল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা কার্যকারণ বিধি। একে এই প্রবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়, Òযেমন কর্ম, তেমন ফল।" একজন কৃষক গম রোপণ করে চাল উৎপাদনের প্রত্যাশা করতে পারে না। তেমনিভাবে প্রতিটি সৎচিন্তা, বাক্য ও কর্ম একই ধরনের ফলাফল দান করে যা আমাদের পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে, আবার প্রতিটি নিষ্ঠুর চিন্তা, রূঢ় বাক্য বা পাপ কার্য আমাদের এই জীবনকে বা পরবর্তী জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৩. ধর্ম-ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্যসমূহ

ধর্ম অর্থ হল ন্যায় বা ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্য। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী-বর্ণের এবং বিশ্বের জন্য যা ভালো। ভালো কর্ম লাভের জন্য ধর্ম মতে জীবন পরিচালনা করতে হবে, অন্যথায় আমাদের কর্ম হবে মন্দ। ধর্ম আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবনকেই প্রভাবিত করে।

৪. মোক্ষ-পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি

মোক্ষ অর্থ পুনর্জন্ম বা 'সংসার' চক্র থেকে মুক্তি। সব হিন্দুর সর্বশেষ লক্ষ্য হল একদিন পুনর্জন্মের চক্র সমাপ্ত হবে এবং তাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে না। এটি তখনই ঘটবে যখন কোন কর্ম থাকবে না যার কারণে ব্যক্তিকে পুনর্জন্ম লাভ করতে হবে অর্থাৎ যখন ভালো বা খারাপ কোন কর্মই থাকবে না।

৫. বেদে পুনর্জন্মের কথা বলা হয়নি, যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল হিন্দুদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বেদে পুনর্জন্মের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দেয়া, সমর্থন করা, এমনকি উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। মৃত্যুর পর আত্মার অন্য দেহে গমনের পুরো ধারণাটাই বেদে অনুপস্থিত।

৬. পুনর্জন্ম অর্থ পুনরায় জন্ম গ্রহণের চক্র নয় বরং মৃত্যুর পরের জীবন

পুনরায় জন্মগ্রহণ বোঝাতে সাধারণত যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা হল 'পুনর্জন্ম/পুনর্জনম'। সংস্কৃতে 'পুনঃ' বা 'পুন' অর্থ 'পরবর্তীতে' বা 'আবারও' এবং 'জনম/জন্ম' অর্থ 'জীবন'। সুতরাং 'পুনর্জন্ম/পুনর্জনম' অর্থ 'পরবর্তী জীবন' বা 'মৃত্যুর পরের জীবন'। এর অর্থ এই নয় যে আপনি বারবার জীবন লাভ করে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। মৃত্যুর পরের জীবনের কথা মাথায় রেখে কেউ যদি হিন্দুধর্মগ্রন্থের যেসব স্থানে পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অধ্যয়ন করে তাহলে তারা পুনর্জন্ম বা বারবার জীবন লাভ নয় বরং পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ধারণাই লাভ করবে। ভগবদ্গীতা ও উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে যে পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এটি দিয়ে তাই বোঝানো হয়েছে। বেদিক যুগের পর বারবার জন্মগ্রহণ করা বা পুনরায় জন্ম গ্রহণের এই ধারণাটি গড়ে ওঠে। স্রষ্টা অবিচার করতে পারেন না- এ কথাটি বিবেচনায় রেখে জন্মের সময় মানুষে মানুষে যে পার্থক্য হয় এবং মানুষ যে বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করার জন্য উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও পূরাণসহ পরবর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে মানুষ সচেতনভাবেই এই মতবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ মত অনুযায়ী, যেহেতু আল্লাহ অবিচার করেন না, তাই মানুষে মানুষে বৈষম্য ও ব্যবধানের কারণ তাদের পূর্বজন্মের কাজের ফল। তবে ইসলামেও এর যৌক্তিক জবাব রয়েছে যা আমরা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব ইনশাল্লাহ্।

৭. বেদে মৃত্যুর পরের জীবন

বেদে মৃত্যুর পরের জীবনের উল্লেখ রয়েছে।

ক. ঋগ্বেদ বই ১০ স্তবক ১৬ শ্লোক ৪

"এ মৃত ব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সে অংশকে তোমার তাপ দ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার শিখা সে অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল শুভকামী সদস্য আছে তাদের দ্বারা এ মৃত্যুকে পুণ্যবান লোকদের ভুবনে বহন করে নিয়ে যাও।"

সংস্কৃত শব্দ 'সুক্রিতামো লোকাম' অর্থ 'পুণ্যবানদের কথা বা পুণ্যবানদের অঞ্চল'। এখানে মৃত্যুর পরের জীবনের কথা বলা হয়েছে।

খ. ঋগ্বেদ বই ১০ স্তবক ১৬ শ্লোক ৫

".. (এই মৃত দেহের) যা অবশিষ্ট আছে তা জীবনপ্রাপ্ত হয়ে উত্থিত হোক, হে জাতবেদা! সে পুনর্বার দেহ লাভ করুক।"

এই শ্লোকেও দ্বিতীয় জীবন তথা মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৮. বেদে স্বর্গের প্রসঙ্গ

স্বর্গের কথা বেদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

ক. অথর্ববেদ বই ৪ স্তবক ৩৪ শ্লোক ৬

"দধি, মধু, ঘৃতাদির দ্বারা পূর্ণ রসের ধারা স্বর্গলোকে মার্ধুযের মত সিঞ্চন করে তোমাকে লাভ করুক। ঘৃতাদি দ্রব্যের মধ্যে যা যা কামনা কর, সেগুলির দ্বারা পূর্ণ হয়ে বহুবিধ পুষ্করিণী তোমার সেবা করুক।"

খ. অথর্ববেদ বই ও স্তবক ৩৪ শ্লোক ২- এ উল্লেখ আছে,

"অমৃতময় শরীর, অতএব অন্তরিক্ষ-সঞ্চারী বায়ুর দ্বারা পবিত্রীকৃত, নির্মল, দীপ্যমান তারা জ্যোতির্ময় ভুবনে গমন করে। স্বর্গালোকে এদের ভোগসাধন তাদের জননেন্দিয়কে

অগ্নিদগ্ধ করে না। সুখের এই ভুবনে তাদের ভোগের জন্য বহু স্ত্রীলোক আছে।”

গ. অথর্ববেদ বই ২ স্তবক ৩৪ শ্লোক ৫- এ উল্লেখ আছে,

অন্তরিক্ষলোকে স্থিত দেবগণ সর্বপ্রথম তোমার শরীর থেকে নিষ্কাস্ত্র আত্মাকে গ্রহণ করুক। তারপর তুমি দেবগণের দ্বারা পরিগৃহীত হয়ে স্বর্গালোকে খাও এবং সেখানে দিব্য ভোগযোগ্য শরীরে প্রতিষ্ঠিত হও। আলোকিতদের (পূর্বপুরুষদের) পথ ধরে আলো ও মুক্তির জগতে প্রবেশ করো।

ঘ. অথর্ববেদ বই ৬ স্তবক ১২২ শ্লোক ৫- এ উল্লেখ আছে,

তোমরা উভয়ে এই কাজ শুরু করো, একে অর্জনের জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাও। যাদের অগাধ বিশ্বাস আছে তারা এই সুখময় আবাসে গমন করবে। আত্মত্যাগের আগুনে তোমরা যে অঞ্জলিই দাও না কেন তোমরা উভয়ে, স্বামী ও স্ত্রী, এগুলো রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকো।

ঙ. ঋগ্বেদ বই ১০ স্তবক ৯৫ শ্লোক ১৮- এ উল্লেখ আছে,হে ইলা! এসকল দেবতা তোমাকে বলছেন যেহেতু তুমি অবশ্যই মারা যাবে, সেহেতু তোমার বংশধরগণ যেন স্বকীয় হোমদ্রব্য দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করে, আর তখনই তুমি স্বর্গে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে।

৯. বেদে নরকের প্রসঙ্গ

নরকের কথাও বেদে বর্ণিত হয়েছে এবং নরক বোঝাতে সংস্কৃতে যে শব্দটি

ব্যবহৃত হয়েছে তা হল 'নরকাস্থানম'। এ বিষয়ে ঋগ্বেদ বই ৪ স্তবক ৫ শ্লোক ৪- তে উল্লেখ আছে। পূজনীয় ও বিদ্বান প্রভুর বিধিবিধান ও আইনকে যারা অবজ্ঞা করে জাজ্বল্যমান ও তিক্ষদন্ত অগ্নিশিখা সন্তাপকর তেজ দ্বারা তাদেরকে দগ্ধ করুক।

ইসলামে মৃত্যুর পরের জীবন

১. পৃথিবীতে একবার জন্মলাভ করা এবং তারপর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করা

কুরআনের ২ নম্বর সূরা বাকারার ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

“তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করিয়াছেন আবার মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হবে।"

ইসলাম বলে মানুষ কেবল একবারই এ পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে এবং মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিনে তাকে আবারো জীবন্ত করা হয়। তার কাজের ওপর নির্ভর করে হয় সে জান্নাতে বসবাস করবে আর না হয় সে জাহান্নামে যাবে।

২. দুনিয়ার জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবনের জন্য একটি পরীক্ষাক্ষেত্র

কুরআনের ৬৭ নম্বর সূরা মুলকের ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

“যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম; তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"

আমরা দুনিয়াতে যে জীবনযাপন করি তা আখেরাতের জীবনের জন্য একটি পরীক্ষা।

আমরা যদি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলি এবং এ পরীক্ষায় পাস করি তাহলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব যেখানে আছে পরম সুখ। আমরা যদি আমাদের সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নিষেধ মেনে না চলি এবং এ পরীক্ষায় পাস করতে না পারি তাহলে আমরা জাহান্নামে নিপতিত হব।

৩. শেষ বিচারের দিনে কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হবে

কুরআনের ৩ নম্বর সূরা আল ইমরানের ১৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে:

"প্রত্যেক আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদিগের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হইবে যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে

দাখিল করা হইবে সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতিত কিছুই নয়।"

৪. বেহেশত - আল জান্নাত

ক. আল জান্নাত অর্থাৎ বেহেশত বা স্বর্গ পরম

সুখের জায়গা। আরবিতে জান্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ 'বাগান'। কুরআনে জান্নাতের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, যেমন বাগান যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। এতে দুধ ও খাঁটি মধুর নদী রয়েছে যার স্বাদ-গন্ধ অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। জান্নাতে সব ধরনের ফল রয়েছে। সেখানে কেউ কখনো ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত হবে না, অলস কথাবার্তাও বলবে না কেউ। সেখানে পাপ করার, সমস্যায়, উদ্বেগে, বিপদে বা দুঃখকষ্টে পড়ার কোন কারণ থাকবে না। জান্নাতে কেবল থাকবে শান্তি আর পরম সুখ।

খ. কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে জান্নাতের বর্ণনা দেয়া আছে, যেমন:

১. আল কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৫ নং আয়াত

২. আল কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৯৮ নং আয়াত

৩. আল কুরআনের ৪ নং সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াত

৪. আল কুরআনের ৫ নং সূরা মায়েদার ১১৯ নং আয়াত

৫. আল কুরআনের ৯ নং সূরা তওবার ৭২ নং আয়াত

৬. আল কুরআনের ১৫ নং সূরা হিজরের ৪৫-৪৮ নং আয়াত

৭. আল কুরআনের ১৮ নং সূরা কাফের ৩১ নং আয়াত

৮. আল কুরআনের ২২ নং সূরা হজ্জের ২৩ নং আয়াত

৯. আল কুরআনের ৩৫ নং সূরা ফাতিরের ৩৩-৩৫ নং আয়াত।

১০. আল কুরআনের ৩৬ নং সূরা ইয়াসিনের ৫৫-৫৮ নং আয়াত

১১. আল কুরআনের ৩৭ নং সূরা আস-সাফ্ফাতের ৪১-৪৯ নং আয়াত

১২. আল কুরআনের ৪৩ নং সূরা জুখরুফের ৬৮-৭৩ নং আয়াত

১৩. আল কুরআনের ৪৪ নং সূরা দুখানের ৫১-৫৭ নং আয়াত

১৪. আল কুরআনের ৪৭ নং সূরা মুহাম্মদের ১৫ নং আয়াত

১৫. আল কুরআনের ৫২ নং সূরা তুরের ১৭-২৪ নং আয়াত

১৬. আল কুরআনের ৫৫ নং সূরা আর-রাহমানের ৪৬-৭৭ নং আয়াত

১৭. আল কুরআনের ৫৬ নং সূরা ওয়াকিয়ার ১১-৩৮ নং আয়াত

৫. দোজখ - জাহান্নাম

দোজখ বা জাহান্নাম নিদারুণ যন্ত্রণার জায়গা যেখানে পাপীরা জাহান্নামের আগুনে পুড়ে ভয়াবহ দুঃখ-যাতনা ও কষ্ট ভোগ করবে। এই আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। আরো বলা হয়েছে যতবারই তাদের চামড়া পুড়বে ততবারই তাদেরকে আবার নতুন চামড়া দেয়া হবে যাতে তারা কষ্ট অনুভব করতে পারে। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোসহ কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে জাহান্নামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে:

১. আল কুরআনের ২ নং সূরা বাকারার ২৪ নং আয়াত

২. আল কুরআনের ৪ নং সূরা নিসার ৫৬ নং আয়াত

৩. আল কুরআনের ১৪ নং সূরা ইবরাহীমের ১৬-১৭ নং আয়াত

৪. আল কুরআনের ২২ নং সূরা হাজ্জের ১৯-২২ নং আয়াত

৫. আল কুরআনের ৩৫ নং সূরা ফাতিরের ৩৬-৩৭ নং আয়াত

৬. মানুষে মানুষে পার্থক্যের যৌক্তিক কারণ –

হিন্দুধর্মে জন্মের সময় মানুষে মানুষে যে পার্থক্য হয় তার কারণ ব্যাখ্যা করতে অতীত কর্ম বা পূর্বজন্মের কাজের কথা বলা হয়েছে। পুনর্জন্মের কোন যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই।

ইসলাম এই ধরনের পার্থক্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করে? কুরআনের ৬৭ নম্বর সূরা আল মুলকের ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম; তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"

এই জীবন মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য এক পরীক্ষা।

হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের শিক্ষার মধ্যে সাদৃশ্য:

১. মদ্যপান নিষিদ্ধ করা

ক) কুরআনের ৫ নম্বর সূরা মায়িদা ৯০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর-যাহাতে তোমরাই সফলকাম হইতে পার।"

খ) নিম্নোক্ত স্থানে উল্লেখ আছে-

১) "মনুস্মৃতি অধ্যায় ৯, শ্লোক ২৩৫

"পুরোহিত হত্যাকারী, মদ পানকারী, চোর এবং গুরুর ফুলশয্যা ভঙ্গকারী- এদের সবাই এবং পৃথকভাবে প্রত্যেকে মহাপাপী লোক হিসেবে পরিচিত হওয়া উচিত।"

দুই শ্লোক পরে উল্লেখ আছে:

২) মনুস্মৃতি ৯ শ্লোক ২৩৮

"এসব হীন লোক- যাদের সাথে কারো খাওয়া উচিত নয়, কারোর এদের জন্য আত্মত্যাগ করা উচিত নয়, কারোর এদেরকে পড়ে শোনানো উচিত নয় এবং কারোর এদেরকে বিবাহ করা উচিত নয়- অবশ্যই পৃথিবীতে বেহুদা ঘুরে বেড়াবে সকল ধর্ম থেকে বিচ্যুৎ ও বহিষ্কৃত হয়ে।"

৩) একই ধরনের শ্লোক মনুস্মৃতি ১১ নং অধ্যায়ের ৫৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে,

“পুরোহিত হত্যা করা, মদপান করা, চুরি করা, গুরুর ফুলশয্যা ভঙ্গ করা এবং যারা এসব কাজ করে তাদের সাথে মেলামেশা করা মহাপাপ।”

৪) মনুস্মৃতি ১১ নং অধ্যায়ের ৯৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "মদ যেহেতু ভাত থেকে নিওড়ানো অপবিত্র ময়লা এবং ময়লাকে মনে করা হয় অশুভ, সেহেতু পুরোহিত, শাসক ও সাধারণ মানুষের মদ পান করা উচিত নয়।"

গ) নিম্নলিখিত অধ্যায় ও শ্লোকসহ মনু স্মৃতির বেশ কিছু স্থানে মদ্যপান/ নেশা

জাতীয় বস্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

১. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৫৯

২. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৭ শ্লোক ৪৭-৫০

৩. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৯ শ্লোক ২২৫

৪. মনুস্মৃতি অধ্যায় ১১ শ্লোক ১৫১

৫. মনুস্মৃতি অধ্যায় ১২ শ্লোক ৪৫

৬. ঋগ্বেদ পুস্তক ৮ স্তবক ২ শ্লোক ১২

৭. ঋগ্বেদ পুস্তক ৮ স্তবক ২১ শ্লোক ১৪

২. জুয়া নিষিদ্ধ করা

পবিত্র কুরআনের ৫ নম্বর সূরার ৯০ নম্বর আয়াতে জুয়া খেলাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা

বলা হয়েছে:

“হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর- যাহাতে তোমরা সফলকাম

হইতে পার।”

ক. হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোতেও জুয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে

ঋগ্বেদ পুস্তক ১০ স্তবক ৩৪ শ্লোক ৩:

"একজন জুয়ারি বলে, 'আমার স্ত্রী আমার কাছ থেকে দূরে থাকে, আমার মা আমাকে ঘৃণা করে।' এই হতভাগ্য ব্যক্তি স্বস্তি লাভের জন্য কাউকে পাবে না।"

ঋগ্বেদ পুস্তক ১০:৩৪:১৩ আরো উপদেশ দেয়া হয়েছে-

"পাশা খেলো না: কখনো না, তোমার শস্যক্ষেত চাষ করো। অর্জন উপভোগ করো এবং মনে করো যে সম্পদ যথেষ্ট।"

মনুস্মৃতি ৭ নং অধ্যায় ৫০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে-

"মদপান, জুয়া খেলা, নারীর সান্নিধ্য লাভ (আইনসম্মতভাবে যাদের বিবাহ করা হয়নি) এবং শিকার করা" - এই ক্রমানুসারে- তার জানা উচিত যে এগুলো হল আকাঙ্ক্ষাজাত পাপের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ চারটি পাপ।

খ. মনুস্মৃতির বেশ কিছু স্থানে জুয়া খেলাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে-

১. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৭ শ্লোক ৪৭

২. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৯ শ্লোক ২২১-২২৮

৩. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৫৮

হিন্দুধর্ম ও ইসলামে ভাগ্য ও কদর সম্পর্কে ধারণা

১. কদর বা নিয়তি সম্পর্কে ধারণা - ইসলামে কদর বা তাকদীর

'কদর' হচ্ছে অদৃষ্ট সম্পর্কে ধারণা। মানব জীবনের কিছু বিষয় আমাদের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন, কখন এবং কোথায় একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে, কোন পরিস্থিতি ও অবস্থার মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করবে, কত বছর সে বেঁচে থাকবে এবং কোথায় ও কখন সে মৃত্যুবরণ করবে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এসব আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন।

২. হিন্দুধর্মে অদৃষ্ট বা নিয়তি সম্পর্কে ধারণা

হিন্দুধর্মে নিয়তি বা ভাগ্য সম্পর্কে ধারণা অনেকটা ইসলাম ধর্মের মতই।

৩. বর্তমান অবস্থা একটি পরীক্ষা

কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যদিয়ে পরীক্ষা করেন। কুরআনের ২৯ নম্বর সূরা আনকাবুতের ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এই কথা বললেই তাহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়াই অব্যাহতি দেওয়া হইবে?"

২ নং সূরা বাকারার ২১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"তোমরা কি মনে কর যে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নাই? অর্থ-কষ্ট ও দুঃখ ক্লেশ তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারা ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁহার সহিত ঈমান আনয়নকারিগণ বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসিবে?' জানিয়া রাখ, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে!"

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩৫ নম্বর আয়াত :

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে, আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা ফিরিয়া আসিবে।"

২ নং সূরা বাকারার ১৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"আমি তোমাদিগকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।"

৮ নং সূরা আনফালের ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

"এবং জানিয়া রাখ যে তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহা পুরস্কার রহিয়াছে।"

৪. প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হবে

প্রতিটি মানুষই এই পৃথিবীতে একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়। আল্লাহ যাকে যে ধরনের অবস্থা ও আরাম আয়েশের মধ্যে রাখে তার ওপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে পরীক্ষার পার্থক্য হয়ে থাকে। সে অনুসারেই তিনি বিচার করে থাকেন। যেমন একজন পরীক্ষক যদি প্রশ্ন কঠিন করেন তাহলে তিনি সাধারণত খাতা খুব বেশি কড়াকড়ি করে দেখেন না। অন্যদিকে তিনি যদি প্রশ্ন সহজ করেন, তাহলে খাতা কড়াকড়ি করে দেখেন।

তেমনি কিছু মানুষ ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে আবার কিছু মানুষ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ইসলাম প্রত্যেক ধনী মুসলমানকে (যার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ নিসাব পর্যায়ের চেয়ে বেশি, অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম সোনার মূল্যের সমপরিমাণ) প্রতি চন্দ্রবর্ষে তার অতিরিক্ত সম্পদের ২.৫% যাকাত (গরীবের পাওনা) দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এটিকে ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা বলা হয়। কিছু ধনী ব্যক্তি হয়ত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দানখয়রাত করেন; কেউ হয়ত যা প্রয়োজন তার চেয়ে কম করেন; কেউ কেউ হয়ত করেনই না। একজন ধনী ব্যক্তি জাকাতের ক্ষেত্রে পূর্ণ নম্বর পেতে পারে, কম নম্বর পেতে পারে এবং একেবারে শূন্যও পেতে পারে। অন্যদিকে একজন দরিদ্র ব্যক্তি, যার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের চেয়ে কম সে যাকাতের ক্ষেত্রে পূর্ণ নম্বর পাবে, কারণ তাকে এই বাধ্যতামূলক দান করতে হবে না। যেকোন স্বাভাবিক মানুষই ধনী হতে চাইবে, দরিদ্র হতে চাইবে না। কেউ কেউ ধনীদের প্রশংসা করতে পারে এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারে। তারা জানে না যে, এই অর্থবিত্ত তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে, যদি তারা যাকাত না দেয় এবং এ সম্পদের কারণে তাদের চরিত্র নষ্ট হতে পারে। অন্যদিকে দারিদ্র্য গরীবদেরকে জান্নাতে যাবার রাস্তা সহজ করে দিতে পারে যদি সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র অন্যান্য হুকুম-আহকাম মেনে চলে। এর বিপরীতটাও সত্য হতে পারে। একজন ধনী ব্যক্তি তার দানশীলতা ও

মানবতার কল্যাণের কারণে জান্নাতে যেতে পারে, অন্যদিকে যে দরিদ্র ব্যক্তি বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষা করে এবং বিলাসিতার সামগ্রী পাবার জন্য অসদুপায় অবলম্বন করে সে শেষ বিচারের দিনে সমস্যায় পড়তে পারে।

সাধারণ প্রশ্ন-উত্তর

১. স্রষ্টা নিয়ে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস বা ধারনা কেমন?

উত্তর: ক. হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ গুলোতে স্রষ্টা নিয়ে আছে- স্রষ্টা মাত্র এক জনই দ্বিতীয় কেউ নেই -(chandogya upanishad - ch.6, sec.2, v.1),

খ. স্রষ্টার কোনো মালিক নেই তার কোনো বাবা-মা নেই তারচেয়ে বড় কেউ নেই,(shvetashvatara upanishad- ch.6, v.9)

গ. স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই, স্রষ্টা নিরাকার কেউ তাকে চোখ দিয়ে দেখতে পায় না। তার কোনো আকৃতি নেই।?(shvetashvatara upanishad- ch.4, v.19)

আরো

রিগবেদেই আছে স্রষ্টার একটা নাম ব্রম্মা যার আরবি অর্থ খালিক যা আল্লাহর একটি নাম। কিন্তু সেটা যদি হয় ৩/৪ টা মাথা ওয়ালা মূর্তি যার মাথায় মুকুট তাহলে সেটা উপনিষদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন কারন উপনিষদেই আছে-

ঘ. স্রষ্টার কোনো প্রতিমা/মূর্তি নেই।(shvetashvatara upanishad -ch.4, v.19) এমন

আরো অনেক রেফারেন্স আছে যেমন ইয়ার্যুবেদ (৪০:৯), (৩২:৩), ঋগবেদ (১.১৬৪:৪৬), (১.১১৪:৫) ইত্যাদি।

ওপর দিকে ইসলামে ও আছে কুরআনের **১১২** নং সূরায়, সূরা ইখলাসে-" বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।"

২. সর্বশেষ প্রেরিত রাসূল এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে হিন্দু ধর্মে এবং ইসলামে কি বলা হয়েছে?

উত্তর: ক. হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ (সা:)এর কথা বলা হয়েছে ; ভবিষ্যপুরানা পর্ব-৩, খন্ড- ৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক (৫-৮),

আরো আছে ভবিষ্যপুরানা পর্ব-৩, খন্ড-১, অধ্যায়-৩, শ্লোক- (২১-২৩)

সর্ব শেষ ও চুড়ান্ত নবী মুহাম্মদ (সা:) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদে- ২০, ১২/ শ্লোক- (১-১৪)

১ম মন্ত্রে আছে তিঁনি হলেন নরোশংশা- নরোশংশা অর্থ যে মানুষের প্রশংসা করা হয়। এটাকে আরবিতে অনুবাদ করলে হবে মুহাম্মদ (সা:); তিনিঁ হলেন কাওরমা, যার অর্থ শান্তির রাজপুত্র আর মুহাম্মদ (সা:) শান্তির রাজপুত্র ছিলেন আর একটা অর্থ হলো যে বিদেশে যায় আর মুহাম্মদ (সা:) হিজরত করেছিলেন মক্কা থেকে মদিনায়। তিনিঁ পরাজিত করবেন ৬০০৯০ জন শত্রুকে মুহাম্মদ (সা:)। যখন মক্কায় ছিল তখন তাঁর বিরুদ্ধে যারা ছিল তারা আনুমানিক ভাবে ৬০০৯০ জন ছিল।

২য় মন্ত্রে তিনি উটের পিঠে চড়বেন, কোন ইন্ডিয়া ঋষি উটের পিঠে চরবেন না কারণ (মানুসম্রিথি অধ্যায়-১১, শোলক-২০২) এ বলা হয়েছে কোনো ব্রাক্ষণ বা ঋষিকে উট বা গাধার পিঠে উঠতে নিষেধ করা হয়েছে।

৩য় মন্ত্রে বলছেন, তিনি মামাঋষি মানে তিনিঁ মহানঋষি আর এছাড়াও অনন্য ধর্মগ্রন্থে বলছেন তিনি মুহাম্মদ ঋষি।

৪র্থ মন্ত্রে তিঁনি রেব যার অর্থ যিনি প্রশংসা করেন আর মুহাম্মদ (সা:) এর আর একটা নাম হলো আহমেদ (সা:) অর্থ যিনি প্রশংসা করেন। এটার সাংস্কৃতি করলে পাবেন রেব। এই মন্ত্র গুলো শুধু একজনকেই নির্দেষ করছে তিনিঁ হলেন সর্বশেষ ও চুড়ান্ত নবী মুহাম্মদ (সা:)। মুহাম্মদ (সা:) এর কিছু ভবিষ্যৎ বাণী বলা হয়েছে (অথর্ববেদে গ্রন্থ-২০ অধ্যায়-২১ পরিচ্ছেদ-৬) সে পরাজিত করবে ১০০০০ শত্রুকে কোনো রকম যুদ্ধ ছাড়াই এখানে খন্দকের যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। আরো আছে (গ-২০,অ-২১,প-৭)

এ বলা হয়েছে তিঁনি আভান্দু যার অর্থ যিনি প্রশংসা করবে, আরো বলা আছে তিনি হবেন এতিম,, এই ভবিষ্যৎ বাণীর কথা আরো আছে (ঋগ্বেদ গ-১, অ-৫৩, প-৯)

সামবেদে আছে তাঁকে দেওয়া হয়েছে অবিনশ্বর আইন যা কুরআন তাঁর নাম দেওয়া আছে আহমেদ। (সামবেদ- অ- ২য়, মন্ত্র-১৫২), (যজুর্বেদ গ-৩১, অ- ১৮), (ঋগ্বেদ- ৮, ৬, প-১০), (আর্থাভাবেদ গ-৩, অ-৫, প-১৬) (গ-২০, অ-১২৬, প-১৪)।

এমন অনেক যায়গায় তাঁর কথা আছে। এ থেকে বোঝা যায় শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) এর কথা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ গুলোতে আছে।

৩. ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের মূল উৎস কি?

উত্তর: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন,

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না"।

এখানে আল্লাহর রজ্জু বলতে পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। ইসলামকে ভালোভাবে বোঝতে হলে পবিত্র কুরআন এবং সহিহ হাদিস (শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর কথা এবং জীবনাচরণ) বোঝতে বা জানতে হবে।

হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র ও মৌলিক উৎস গুলো হলো বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, ভগবদ্ গীতা, পুরাণ ইত্যাদি।

৪. ইসলামের মূল বিশ্বাস (ঈমান) এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত মূল বিশ্বাস কি একই?

উত্তর: হ্যাঁ!

ইসলামের মূল বিশ্বাস হলো ৬টি।

১. আল্লাহ, ২. ফেরেশতা, ৩. কিতাবসমূহ, ৪. পরকাল, ৫. নবুওয়ত অর্থাৎ রাসূলদের উপর, ৬. কদর বা ভাগ্য।

পবিত্র কুরআনের ২নং সূরা বাকারাহর আয়াত ১৭৭ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বলেছে,

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْہَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ

"ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি।"

সহিহ মুসলিমে বলা হয়েছে, রাসুল (সা:) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, ঈমান কি? তিনি (নবীজি) বললেন,তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেস্তাগন,তাঁর কিতাবসমূহ,তাঁর সাথে সাক্ষাৎ, তাঁর রাসূলগণ এবং পুনরুত্থান অর্থাৎ পরকাল এবং কদর বা ভাগ্যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে।

অপরদিকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে-

১) আল্লাহ

"ইকাম ইভানদ্বিতীয়াম"

তিনি এক যার কোনো দ্বিতীয় নাই। (ছান্দোগ্য উপনিষদ অধ্যায়- ৬, সেকশন- ২, শ্লোক ১) অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ এর কথা আছে।

উপনিষদ, ভগবদগীতা, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ঋগ্বেদ কিতাবসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের একত্ববাদের কথা আছে।

২) ফেরেশতা বা দেবদূত

হিন্দু ধর্মে দেবদূত বা ফেরেশতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো ধারনা নেই।তবে হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে কিছু অতিমানব রয়েছে যারা সাধারন মানুষ যা করতে পারে না তারা তাও করতে পারে এইসব অতিমানবদের কে কিছু কিছু হিন্দু দেবতা মনে করে উপাসনা করে।

৩) পবিত্র কিতাব

হিন্দু ধর্মে দুইধরনের পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে। শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত তাহলো বেদ ও উপনিষদ। এগুলোকে ঈশ্বরের বাণী মনে করেন হিন্দুরা।সবচেয়ে শুদ্ধ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ হলো বেদ।এছাড়া হিন্দুদের আরো অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে।

৪) পরকাল বা মৃত্যুর পরের জীবন

ক. ঋগবেদ বই ১০, স্তবক ১৬, শ্লোক ৪

"এ মৃত ব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সে অংশকে তোমার তাপ দ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার শিখা সে অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল শুভকামী সদস্য আছে তাদের দ্বারা এ মৃত্যুকে পুণ্যবান লোকদের ভুবনে বহন করে নিয়ে যাও।"

সংস্কৃত শব্দ 'সুক্রিতামো লোকাম' অর্থ 'পুণ্যবানদের কথা বা পুণ্যবানদের অঞ্চল'। এখানে মৃত্যুর পরের জীবনের কথা বলা হয়েছে।

খ. ঋগ্বেদ বই ১০, স্তবক ১৬, শ্লোক ৫

গ. বেদে স্বর্গের প্রসঙ্গ-

অথর্ববেদ বই ৪, স্তবক ৩৪, শ্লোক ৬

ঘ. অথর্ববেদ বই ৪, স্তবক ৩৪, শ্লোক ২- এ উল্লেখ আছে,

ঙ.অথর্ববেদ বই ২, স্তবক ৩৪, শ্লোক ৫- এ উল্লেখ আছে,

চ. অথর্ববেদ বই ৬, স্তবক ১২২, শ্লোক ৫- এ উল্লেখ আছে,

ছ.ঋগ্বেদ বই ১০, স্তবক ৯৫, শ্লোক ১৮- এ উল্লেখ আছে,

জ. বেদে নরকের প্রসঙ্গ-

ঋগ্বেদ বই ৪, স্তবক ৫, শ্লোক ৪- তে উল্লেখ আছে।'

৫) অবতর বা নবুওয়ত

অবতার শব্দটি এসেছে 'অব' এবং 'তর' থেকে যার অর্থ নিচে নেমে আসা। কতিপয় পণ্ডিতের মতে ঈশ্বরের অবতার একটি সম্বন্ধপদ এবং এর প্রকৃত অর্থ "আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এমন ব্যক্তির আগমন।" চারটি বেদেরই বেশ কিছু জায়গায় ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত এসব ব্যক্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এভাবে আমরা যদি ভগবদ্গীতা ও পুরাণকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ বেদের সাথে তুলনা করি তাহলে আমাদেরকে মানতেই হবে যে যখন ভগবদ্গীতা ও পুরাণে অবতারের কথা বলা হয়, তখন ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়। ইসলামে তাদেরকেই নবী বলা হয়।

৬) ভাগ্য এবং অদৃষ্ট সম্পর্কে

হিন্দুধর্মে নিয়তি বা ভাগ্য সম্পর্কে ধারণা অনেকটা ইসলাম ধর্মের মতই।

কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যদিয়ে পরীক্ষা করেন। কুরআনের ২৯ নম্বর সূরা আনকাবুতের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ.

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এই কথা বললেই তাহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়াই অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

এভাবে আরো আছে জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে; আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা ফিরিয়া আসিবে"। (২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩৫ নম্বর আয়াত)।

৫. বেদ এবং কুরআনের মধ্যে মিল কোথায়?

উত্তর: বেদে এমন অনেক শ্লোক আছে যার সাথে কুরআনের আয়াতের সাদৃশ্য রয়েছে:

ইসলাম	হিন্দুধর্ম
১. "সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।" (সূরা আল ফাতিহা ২ নম্বর আয়াত)	১. নিশ্চয় মহান সৃষ্টিকর্তার মহিমা বিশাল। (ঋগ্বেদ ৫:৮১:১)
২. "যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।" (সূরা আল ফাতিহা ৩ নম্বর আয়াত)	২. অসীম দানশীল। (ঋগ্বেদ ৩: ৩৪: ১)
৩. "আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাহাদের পথ যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধে-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।" (সূরা আল ফাতিহা ৬-৭ নম্বর আয়াত)	৩. "আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করো এবং যে পাপ আমাদেরকে বিপথে বত করে তা থেকে মুক্ত করো।" (যজুর্বেদ ৪০:১৬) একই ধরনের কথা আছে ঋগ্বেদ বই ১ মন্ত্র ১৮৯ শ্লোক১, ২ (ঋগ্বেদ ১:১৮৯:১,২)
৪. "তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে (ধর্ম) অস্বীকার করে? সে তো সে-ই যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।" (সূরা মাউন ১-৩ নম্বর আয়াত)	৪. "যখন কোনো ক্ষুধাতর ব্যাক্তি রব করতে করতে উপস্থিত হয় এবং অন্ন ভিক্ষা করে তখন যে অন্নবান হয়েও হৃদয় কঠিন করে রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাকে কেউ কখনো সুখি করে না।" (ঋগ্বেদ ১০:১১:২)

এমন আরো অনেক আছে।

৬. সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আইন এবং শিক্ষার কোন পরির্বতন হয় কি না ?

উত্তর: ঈশ্বরের বিধান যদি নির্দিষ্ট কোনো গোত্রের বা সময়ের জন্য হয় তাহলে তা পরিবর্তন হয়। যেমন: তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এগুলো ঈশ্বরের বানী, কিন্তু এগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু ঈশ্বরের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বাণী নাজিল হওয়ার পর

কোনো কিছু যুক্ত করা যাবে না বা কোনো কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না। কুরআন হলো সর্বশক্তি আল্লাহর সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বার্তা আর কোনো ওহি নাজিল হবে না।

কুরআনের সূরা মায়িদা, আয়াত- ৩ এ বলা হয়েছে,

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।"

নবী মুহাম্মদ (সা:) হলো সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী। আর কোনো নবী আসবেন না।

সূরা আহযাবে (৩৩) আয়াত-৪০,

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।* আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

পুরাতন ওহি পরিবর্তন হতে পারে। তবে মূল বার্তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) সম্পর্কে তাহলো একই। প্রায় সব গ্রন্থ যেগুলো কুরআনের আগে আসছে সেগুলোর আসল রুপে আর নেই, সেগুলো সংরক্ষণ করা নেই, আল্লাহ সেগুলো সংরক্ষন করা প্রয়োজন মনে করেনি। এবার যদি কুরআনের ব্যাপারে বলেন; আল্লাহ বলেছেন,

"নিশ্চয় আমি কুরআন* নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী। "

(সূরা হিজর, আয়াত-৯)

সুতরাং এটা পরিবর্তন হবে না এটা চূড়ান্ত।

৭. মানুষের কি পুনর্জন্ম হয় ?

উত্তর: হিন্দু ধর্মের সবথেকে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ হলো বেদ। বেদ বলছে পুনর্জন্ম সম্পর্কে। কুরআনও বলছে পুনর্জন্ম সম্পর্কে। পুনর অর্থ পরে আর জনম অর্থ জীবন অর্থাৎ, পুনর্জন্ম হলো মৃত্যুর পরের জীবন। কোথাও বেদ বলছে না জীবন-মৃত্যু, জীবন-মৃত্যু

কোথাও না। ভগবত গীতা ও এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। জীবন-মৃত্যুর থিওরিকে বলা হয় পুনর্জন্ম। এই থিওরিটা দাঁড় করিয়েছেন হিন্দু ধর্মের পন্ডিতেরা। এটা বেদের কোথাও উল্লেখ নেই। কেন কিছু লোক দেব, কিছু লোক ধনী, কিছু লোক গরিব পরিবারের, ঈশ্বর এমন অবিচার করেছেন কেন তারা এগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারতেন না তাই তারা জীবন-মৃত্যুর কর্ম আর ধর্ম নামক একটা দর্শন নিয়ে এলেন। কর্ম হচ্ছে কাজ আর ধর্ম হচ্ছে বিধান। কেন একজন মানুষ হৃদরোগ নিয়ে জন্ম নিবেন? পন্ডিতরা বলে শেষ জীবনে সে কিছু পাপ করেছিল। এটি হিন্দু ধর্মের পন্ডিতদের একটি নিদর্শন/অনুমান, বেদের নয়। তাই তারা নিদর্শন নিয়ে এলো আর বলল, যদি তারা ভালো কাজ করে তাহলে পরবর্তী জীবনে উঁচু জাতে জন্মগ্রহণ করতে পারবে। আর হিন্দু ধর্মের ভাতৃত্ব হচ্ছে সব জীবন্ত প্রাণীই ভাই, তাই হতে পারে কখনো জন্মাবেন তেলাপোকা হয়ে, কখনো কুকুর, বিড়াল কিংবা ইদুর আবার কখনোও বা মানুষ হয়ে। মানুষ হচ্ছে সর্বোচ্চ লেভেল, ভালো কাজ করলে উঁচু জাতে জন্মাবেন। খারাপ কাজ করলে নিচু জাতে জন্মাবেন। মানুষ হয়ে সাতবার জন্মানো যায়। এটা হিন্দু পণ্ডিতদের দর্শন। এই পৃথিবীতে পাপ বাড়ছে, মানুষ ও দিন-দিন বাড়ছে। যেহেতু পাপ বাড়ছে, সেহেতু মানুষ তো কমার কথা। তাই তাদের দর্শন লজিক্যালি মিলে না। এইজন্য পুনর্জন্ম হলো মৃত্যুর পরের জীবন।

দাওয়াহ দেওয়ার পদ্ধতি (কথোপকথন)

আহমেদঃ আসসালামুআলা মানিত্তাবাউল হুদা।

মহেশঃ ওয়ালাইকুম/নমষ্কার

আহমেদঃ কেমন আছেন দাদা?

মহেশঃ আছি ভগবানের কৃপায়।

আহমেদঃ আমাদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে।মুসলিমরা হিন্দু দেখলে দূরে দূরে থাকে হিন্দুরাও মুসলিম দেখলে দূরে দূরে থাকে। আপনার কপালে লেখা নাই হিন্দু, আমার কপালেও লেখা নাই মুসলিম। আপনার শরীরে কেটে গেলে রক্ত লাল বের হবে আমারও লাল। আপনার আমার মধ্যে যেমন পার্থক্য নাই,আপনার আমার মালিকের মধ্যে তেমন পার্থক্য নাই। আপনার আমার মালিক একজন। আর আমাদের সবার মালিকের নাম কি?

মহেশঃ আমার মালিকের নাম তো ভগবান।

আহমেদঃ না দাদা।আমাদের মালিক একজনই।আমাদের সবাইকে ই আল্লাহ সৃষ্টি করেছে। তাই হিন্দু, খ্রিস্টান,মুসলিম যে ই হোক দুনিয়ায় সবার মালিক আল্লাহ।

মহেশঃ আমার মালিক যে একজন তার প্রমান কি?

আহমেদঃ পবিত্র কুরআনে আছে-সূরা ইখলাসে (১-৪):

“বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।”

আবার আপনাদের ধর্মীয় বই উপনিষদে আছে-

১. স্রষ্টা মাত্র এক জনই দ্বিতীয় কেউ নেই -(ছান্দোগ্য উপনিষদ - ch.6, sec.2, v.1), ২. স্রষ্টার কোনো মালিক নেই তার কোনো বাবা-মা নেই তার চেয়ে বড় কেউ নেই, (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ- চ.৬, ভ.৯)

৩. স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই, স্রষ্টা নিরাকার কেউ তাকে চোখ দিয়ে দেখতে পায় না। তার কোনো আকৃতি নেই। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ- ch.4, v.19)

৪. সে সব লোক যাদের বিচার বুদ্ধি কেঁড়ে নিয়েছে জাগতিক আকাঙ্খা, যারা অপদেবতার উপাসনা করে; সব জড়বাদী লোকেরা অপদেবতার অনুসারী করে আর মূর্তি পূজা করে। (ভগবদ্গীতা-চ.৭, ভ.২০)

৫. সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি নেই,তিনি কখনো জন্মায়নি তারই উপাসনা করা উচিত। (যজুর্বেদ ch.32, v.3)

৬. সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার এবং পবিত্র (যজুর্বেদ- ch.40, v.8)

এমন আরো অনেক জায়গা আছে।

সুতরাং মালিক একজন, এই মালিকের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না।

মহেশঃ কেন শরীক করা যাবে না?

আহমেদঃ কারণ আপনাদের কিতাবেই আছে-

"তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা করে যেমন আগুন, পানি, বাতাস ইত্যাদি।এখানে আরো উল্লেখ আছে, তারা আরো অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা পূজা করে মানুষের তৈরি জিনিসের যেমন- চেয়ার, টেবিল, মূর্তি, ইত্যাদি।"

(যজুর্বেদ- ch.40, v.9)

দাদা, নবী মুহাম্মদ (সা :) আপনারও নবী আমারও নবী।

মহেশঃ সেটা কিভাবে?

আহমেদঃ আপনাদের একটা কিতাব আছে কল্কি পুরান সেখানে উল্লেখ আছে ৪ টা যুগের কথা। এখন কোন যুগ চলে ভাই?

মহেশঃ কলি যুগ।

আহমেদঃ হ্যাঁ। কল্কি পুরানে আছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবতর আসে, আর এই কলি যুগে একজন অবতর আসবেন যার নাম হবে নরসংশ , তার পিতার নাম বিষ্ণু-যশা, মাতার নাম সুমতি, জন্মস্থান সম্বল, জন্ম তারিখ মাধব মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশ তারিখ। নরশংসর বাংলা অর্থ প্রশংসিত ব্যক্তি আরবিতে মোহাম্মদ (সা:), তার পিতার নাম বিষ্ণু যশা বাংলা অর্থ মালিকের দাস আরবিতে আব্দুল্লাহ, মাতার নাম সুমতি বাংলা অর্থ নিরাপদ শান্তি আরবিতে আমেনা। তার জন্মস্থান সম্বল যার বাংলা অর্থ শান্তির ঘর যেটা মক্কা মোকাররমা, তার জন্ম তারিখ মাধব মাসে মাধব অর্থ রবি শুক্লপক্ষে মানে প্রথম অংশে যেটা আউয়াল অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ যেটা নবী মুহাম্মদ (সা:) এর সাথে সম্পূর্ণ মিল। আপনাদের কিতাবেই আছে তাকে শেষ অবতর অর্থাৎ শেষ নবী হিসেবে মানতে হবে। আর তার উপর কুরআন নাজিল হয়েছে। আর এই কুরআন শুধু মুসলিমদের না সকল মানব জাতির এমনকি আপনারও এজন্য কুরআনকে ভালোভাবে জানতে হবে বুঝতে হবে।

মহেশঃ আচ্ছা বুঝলাম কিন্তু ইসলামকেই মানতে হবে তার প্রমাণ কি?

আহমেদঃ কুরআনেই আছে সূরা আলে ইমরান এর ১৯ নং আয়াতে -নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।

এজন্য কুরআনকে পরিপূর্ণ ভাবে মানতে হবে এবং নবী মুহাম্মদ (সা:) কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111543408/